POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

## আল্লাহ্‌র বাণী

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (اعراف:206)

এবংতুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

(আল আরাফ: ২০৬)


بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 8

সংখ্যা 1-2

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 5-12 জানুয়ারী, 2023 12-19 জামাদিউল সানি 1444 A.H


## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

### তিন ব্যক্তির জন্য রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সতর্কবাণী।

১৪১০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে (স্নেহভরে) দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না আর তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। এক, সেই ব্যক্তি, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও অপর মুসাফিরকে দেয় নি, দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে কোনও ইমামের বয়আত করেছে শুধু জাগতিক স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে। যদি সে (ইমাম) তাকে জাগতিক সম্পদ দেয় তবে সন্তুষ্ট হয় আর না দিলের ক্ষুব্ধ হয়। তৃতীয়, সেই ব্যক্তি, যে আসরের পর বাজারে নিজের পণ্য রেখে বলে: সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই! আমি এই পণ্যের এত দাম পাচ্ছিলাম, এরপর কোনও ব্যক্তি তাকে সত্যবাদী মনে করে (সেই পণ্য কিনে নেয়)। এর তিনি (সা.) এই আয়াতটি পাঠ করেন: অর্থাৎ যারা আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু মূল্য গ্রহণ করে।.....

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল মাসাকাত)

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ○

অনুবাদ: এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাহার স্কন্ধে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাহার (কর্মফলের) কিতাবকে বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিব,যাহ সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাইবে। (বনী ইসরাঈল, আয়াত:১৩)

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের অন্তরের উপর তার প্রত্যেকটি কর্মের প্রভাব পড়ে। মানুষ পুণ্যকর্ম করলে তার অন্তরকে জ্যোতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় আর পাপ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। অনুরূপভাবে পুণ্য সম্পাদানকারী ব্যক্তির অন্তরে পুণ্যের জ্যোতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এমনকি তার পুরো অন্তর আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই ব্যক্তি তখন নাজাত প্রাপ্ত হয়। আর পাপ সম্পাদানকারীর অন্তরে কারো দাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি একদিন গোটা অন্তরটাই কালো হয়ে যায়। অবেশেষে সে ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ কেউ 'তায়ের' (পাখি)-র অর্থ করেছে 'ভাগ্য'। কিন্তু এটি এর অর্থ হতে পারে না। কেননা 'তায়ের' বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা, খোদা তা'লা যা নির্ধারণ করেছেন তাকে পাথর কিম্বা 'তক' (জোয়াল) বলা হবে, 'তায়ের'বলা হবে না।

এর এও অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষের পুণ্যকর্ম ও মন্দকর্ম তার কাঁধে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অথচ সে অন্য কোনও জিনিষে ভাগ্য খুঁজে বেড়ায়। কাঁধ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ মানুষ যখন পুণ্যকর্ম করে তখন তার মাথা উঁচু হয়ে যায়। আর মন্দকর্ম করলে লাঞ্ছনার কারণে মাথা হেট করে থাকে। অতএব, এই শব্দ ব্যবহার করে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজের কর্মসমূহকে তার কাঁধের মাধ্যমে যাচাই করে নিক। অর্থাৎ সে দেখুক যে, সে তার সঙ্গী -সাথীদের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে কি না। যদি তার অন্তর এবং সাথীরা তাকে কলঙ্কমুক্ত আখ্যায়িত করে, তবে তাকে বুঝে নিতে হবে যে সে পুণ্যের পথে বিচরণ করছে। কিন্তু যদি তার হৃদয় ও সাথীরা তার মাঝে শত শত কলুষ দেখতে পায়, তবে মানুষের মাঝে গর্ব করে তার কি লাভ?

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১২)

**আমি ধর্মের জন্য আর ধর্মের জন্যই জীবন ব্যতীত করি। অতএব, আমি চাই, ধর্মের পথে কোনও বাধা যেন সৃষ্টি না হয়।**

## হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

### সংকোচ

একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ভীষণ মাথা যন্ত্রণা করছিল, আর তাঁর চারপাশে মহিলা ও শিশুদের কোলাহল ছিল। মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব নিবেদন করলেন, মহাশয়ের এই কোলাহলের কারণে অসুবিধা হয় না তো?

হুযুর (আ.) বললেন: এরা যখন শান্ত হয়, আমি কিছুটা স্বস্তি পায়। "

মৌলবী সাহেব বললেন, তবে আপনি এদেরকে নীরব থাকতে বলছেন না কেন? হুযুর (আ.) বললেন: আপনিই এদেরকে বিনীতিভাবে বলে দিন, আমি কিছুতেই বলতে পারব না।"

### অপরের দোষ-ত্রুটি আড়াল করা

একবার এক পরিচারিকা বাড়ি থেকে চাউল চুরি করে ধরা পড়ে যায়। বাড়ির সকলে তাকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে। ঘটনাক্রমে হযরত আকদস (আ.) সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। ঘটনা শুনে হুযুর আকদাস (আ.) বললেন: অভাবী মানুষ, কিছুটা চাউল তাকে দিয়ে দাও, বকাঝকা করো না। যেভাবে খোদা তা'লা মানুষের দোষত্রুটি আড়াল করে রাখেন, তোমরাও সেই পন্থা অবলম্বন কর।"

### মানব সেবা:

এক দিন কিছু গ্রাম্য মহিলা হযরত আকদস (আ.)-এর কাছে শিশুদের ওষুধ নিতে আসে। হুযুর (আ.) রুগী দেখতে এবং ওষুধ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তা দেখে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব নিবেদন করলেন, হুযুর! এটা তো অনেক কষ্টের কাজ আর এতে অনেক মূল্যবান সময় অপচয় হয়। এর উত্তরে হুযুর (আ.) বললেন: এটাও তো ধর্মীয় কাজ। এরা সব অভাবী মানুষ। এখানে কোন হাসপাতাল নেই। আমি এদের জন্য হরেক রকম এলোপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধ কিনে মজুত করে রাখি, যেগুলি সময়ে কাজে আসে। এটা অনেক বড় পুণ্যের কাজ। এই সব কাজে একজন মোমেনের অলস ও উদাসীন থাকা উচিত নয়। "

### সময়ের মূল্য

হুযুর আকদস (আ.) অহেতুক আনুষ্ঠানিকতায় সময় অপচয় করা অপছন্দ করতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন: আমার অবস্থা এমন যে, প্রাত্যহিক জরুরী শৌচকর্মতে যে সময় যায়, আমার তাতেও দুঃখ হয় যে এতে এতটা সময় নষ্ট হয়ে যায়, এটাও যদি কোনও ধর্মীয় কাজে ব্যয় হত! যখন কোনও জরুরী ধর্মীয় কাজ এসে পড়ে, তখন সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি পানাহার ও নিদ্রাকেও নিজের জন্য নিষিদ্ধ বলে মনে করি। আমি ধর্মের জন্য আর ধর্মের জন্যই জীবন ব্যতীত করি। অতএব, আমি চাই, ধর্মের পথে কোনও বাধা যেন সৃষ্টি না হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৯)

**পুণ্য সম্পাদানকারী ব্যক্তির অন্তরে পুণ্যের জ্যোতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এমনকি তার পুরো অন্তর আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই ব্যক্তি তখন নাজাত প্রাপ্ত হয়।**

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# জুমআর খুতবা

**লোকদের মাঝে এমন কেউ নেই যে তার নিজ জীবন ও সম্পদের মাধ্যমে আমার সাথে আবু বকর বিন আবু কাহাফার চেয়ে অধিক উত্তম আচরণ করেছে। (হাদীস)**

**অজ্ঞতার যুগে হযরত আবু বকর (রা.) –কে কুরাইশের নেতৃ স্থানীয় এবং তাদের অভিজাত ও সম্মানীয় লোকদের মাঝে গণ্য করা হতো।**

**হযরত আবু বকর (রা.) দরিদ্র এবং মিসকিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। শীতকালে কম্বল ক্রয় করে সেগুলো অভাবীদের মাঝে বিতরণ করতেন।**

**হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফত থেকে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থসিদ্ধি করেন নি, বরং সৃষ্টির সেবার মাঝেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব মনে করতেন।**

**অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)–এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)–ই ভিড় ঠেলে মহানবী (সা.)–এর কাছে পৌঁছেন।**

---

**যেভাবে স্বপ্নে জিব্রাঈল বায়তুল মুকাদ্দাসের সফরে তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন তেমনিভাবে আবু বকর (রা.) হিজরতে তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। তিনি (রা.) বলতে গেলে সেভাবেই তাঁর অনুগত ছিলেন যেভাবে জিব্রাঈল আল্লাহ্ তা'লার অনুগত হয়ে কাজ করেন।**

**হে আল্লাহ্‌র রসূল(সা.)! আমি নিজ প্রাণের জন্য ভীত নই। আমি যদি মারা যাই তবে কেবল একজন ব্যক্তি মারা যাবে ;আমি তো আপনার প্রাণ নিয়ে শঙ্কিত, কেননা আপনার কোনো ক্ষতি হলে জগত থেকে সত্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"**

**হযরত আবু বকর (রা.) কুরবানী করার পরও মনে করতেন, এখনো আমি খোদার কাছে ঋণী। আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কোনো অনুগ্রহ করি নি, বরং আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হলো তিনি আমাকে তৌফিক দিয়েছেন।**

**আঁ হযরত (সা.)–এর মহান মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)–এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।**

**সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক** লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ২৫নভেম্বর, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা ( ২৫ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)–এর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর সৃষ্টি সেবা এবং অভাবীদের আহার করানো ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশদের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের মাঝে গণ্য হতেন এবং যে কোন সমস্যায় নিপতিত হলেই লোকেরা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করত। মক্কায় তিনি প্রায়শই অতিথি আপ্যায়ন করতেন এবং বড় বড় ভোজের আয়োজন করতেন।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯০)

অজ্ঞতার যুগে হযরত আবু বকর (রা.) –কে কুরাইশের নেতৃ স্থানীয় এবং তাদের অভিজাত ও সম্মানীয় লোকদের মাঝে গণ্য করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.)–কে সেই সমাজে কুরাইশের অভিজাত লোকদের মধ্যে গণ্য করা হতো আর (তিনি) সর্বোত্তম মানুষদের মাঝে গণ্য হতেন। লোকেরা তাদের বিপদাপদ এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হতো। মক্কায় অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা–মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৫২–৫৩)

এছাড়া লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) দরিদ্র এবং মিসকিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। শীতকালে কম্বল ক্রয় করে সেগুলো অভাবীদের মাঝে বিতরণ করতেন।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক কে ফয়সালে, পৃ: ৩৭৮)

একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর (রা.) এক বছর গরম চাদর ক্রয় করেন, অর্থাৎ গ্রাম থেকে আনা কম্বল ক্রয় করেন এবং শীতকালে মদীনার বিধবাদের মধ্যে এসব চাদর বণ্টন করা হয়।

(কুনযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ৫ম ভাগ, পৃ: ২৪৫, হাদীস–১৪০৭৬)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পূর্বে তিনি একটি সহায়–সম্বলহীন পরিবারের জন্য ছাগলের দুধ দোহন করতেন। তিনি খলীফা (নির্বাচিত) হওয়ার পর সেই পরিবারের ছোট্ট একটি মেয়ে বলে, এখন তো আর আপনি আমাদের ছাগলের দুধ দোহন করবেন না। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কেন করব না? নিজ প্রাণের কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (দুধ) দোহন করব; আর আমি আশা রাখি, আমি যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা আমার এই অভ্যাসে বাদ সাধবে না। অতএব পূর্বরীতি অনুযায়ী তাদের ছাগলগুলোর দুধ তিনি (রা.) দোহন করতে থাকেন। সেই মেয়েরা যখন তাদের ছাগলগুলো নিয়ে আসত তখন তিনি স্নেহের সাথে বলতেন, দুধের ফেনা তৈরি করব, না কি করব না? তারা যদি বলত, ফেনা তৈরি করে দিন, তাহলে তিনি পাত্রটি সামান্য দূরে রেখে দুধ দোহন করতেন, ফলে অনেক ফেনা হতো। কিন্তু যদি তারা বলত, ফেনা বানাবেন না, তখন পাত্রটি ওলানের কাছে রেখে দুধ দোহন করতেন যেন দুধে ফেনা না হয়। তিনি (রা.) অবিরাম ছয় মাস পর্যন্ত এই সেবা প্রদান করতে থাকেন, অর্থাৎ খিলাফত লাভের ছয় মাস পর পর্যন্ত। এরপর তিনি মদীনায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)–এর দুটি বাড়ি ছিল। একটি বাড়ি (মদীনার) বাইরে ছিল, মহানবী (সা.)–এর যুগে সেখানে বসবাস করতেন; কিন্তু মহানবী (সা.) মসজিদে নববীর নিকটে নিজ বাড়ি সংলগ্ন একটি জমি তাঁকে দান করেছিলেন, সেখানেও তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন। এছাড়াও একটি বাড়ি ছিল, মদীনায়ও দুটি বাড়ি ছিল। কিন্তু পূর্বে মহানবী (সা.)–এর জীবদ্দশায় তিনি অধিকাংশ সময় শহরতলীতে যে বাড়ি ছিল সেখানেই থাকতেন। পরবর্তীতে খলীফা হওয়ার পর মদীনায় স্থানান্তরিত হন। মদীনায় না আসা পর্যন্ত তিনি (রা.) সেই মেয়েদের (ছাগলের দুধ দোহনের) যে দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন তা পালন করতে থাকেন। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮–১৩৯)

হযরত উমর (রা.) মদীনার (এক) প্রান্তে বসবাসকারী এক বৃদ্ধা ও অন্ধ মহিলার দেখাশোনা করতেন। তিনি তার জন্য পানি আনতেন এবং তার কাজকর্ম করে দিতেন। একবার তিনি তার বাড়িতে গেলে বুঝতে পারেন যে, তাঁর পূর্বে

কেউ এসেছিল যে এই বৃদ্ধার কাজকর্ম করে দিয়েছে। পরের বার তিনি সেই বৃদ্ধার বাড়িতে তাড়াতাড়ি যান যেন অন্যজন আগে আসতে না পারে। হযরত উমর (রা.) লুকিয়ে বসে থাকেন এবং দেখতে পান যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) যিনি ঐ বৃদ্ধার বাড়িতে যেতেন , অথচ তখন হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা ছিলেন।

এটি দেখে হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এমন (মানুষ) কেবল আপনিই হতে পারেন।

(তারিখুল খোলাফা, প্রণেতা- জালালুদ্দীন সুইয়ুতি, পৃ: ৬৪)

অর্থাৎ এই পুণ্যকাজে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে কেবল আপনিই পারেন।

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, মূসা বিন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন, মু'তামের তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আবু উসমান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) তাকে বলেছেন, সুফ্‌ফাবাসীরা অভাবী ছিলেন। একবার মহানবী (সা.) বলেন, যার কাছে দুজনের খাবার রয়েছে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে এবং যার কাছে চারজনের আহার আছে সে পঞ্চম বা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে, কিংবা এমনই কিছু শব্দ বলেছেন। অর্থাৎ লোকেরা যেন সেসব দরিদ্র মানুষকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়ায় যারা (সেখানে) বসে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তিনজনকে নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.) দশজনকে নিয়ে যান। তাঁর বাড়িতে হযরত আবু বকর (রা.) এবং আরো তিনজন (আগে থেকেই) ছিলেন; হযরত আব্দুর রহমান বলতেন, আমি এবং আমার বাবা ও আমার মা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না আব্দুর রহমান একথাও বলেছিল কি না যে, আমার স্ত্রী বা আমার সেবক যে আমার ও হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ের বাড়িতেই কাজ করত। আর (ঘটনাটি) এমন হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে রাতের খাবার খান, এরপর সেখানেই অবস্থান করেন আর ইশার নামায পড়ার পর ফিরে আসেন। {আবু বকর (রা.)} অতিথিদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এরপর মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং অবস্থান করেন আর সেখানেই (রাতের) খাবার খান। (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেন, সেখানে এতক্ষণ অবস্থান করেন যে, মহানবী (সা.)-এর বাড়িতেই তিনি রাতের খাবার খান এবং রাতের এতটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর (নিজের বাড়িতে) আসেন যতটা আল্লাহ্ চেয়েছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, কী এমন কাজ ছিল যা আপনার জন্য অতিথিদের, (বা তিনি বলেন,) অতিথির কাছে আসতে বাদ সাধছিল? অর্থাৎ, আপনি এত দেরি করেছেন কেন? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কি তাদেরকে খাবার খাওয়াও নি? তিনি বলেন, তারা আপনার না আসা পর্যন্ত খাবার খেতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। অতিথিরা বলছিলেন, আবু বকর (রা.) না আসা পর্যন্ত আমরা খাবার খাব না। তিনি তো তাদেরকে খাবার পরিবেশ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমি তাদেরকে খাবার পরিবেশন করেছিলাম; কিন্তু অতিথিরা তার কথা মানেন নি। হযরত আব্দুর রহমান বলতেন, আমি এই ভয়ে লুকিয়ে থাকি যে, পাছে হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ধমক দিয়ে বলে না বসেন যে, অতিথিদের খাবার খাওয়াও নি কেন? আব্দুর রহমান বলতেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'আরে বোকা!' এবং তিনি আমাকে চরম অলস বলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) অতিথিদের বলেন, আপনারা খাবার খান; এবং স্বয়ং আবু বকর (রা.) কসম খান যে, আমি কিছুতেই (খাবার) খাব না। হযরত আব্দুর রহমান বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যে গ্রাসই মুখে দিতাম এর নীচে (থালায়) তার চেয়েও বেশি খাবার হয়ে যেত। আর তারা এতটা খাবার খান যে, পরিতৃপ্ত হয়ে যান। কিন্তু (খাবার) পূর্বে যতটা ছিল তার চেয়েও (পরিমাণে) বেড়ে যায়।

অতিথিদের খাবার খাওয়ান, তারা খাবার খেয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বলেন, খাবার ততটাই রয়ে যেত বরং আরো বৃদ্ধি পেত, অথচ সবাই পেট ভরে খেয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন দেখেন, খাবার যতটা ছিল ততটাই আছে, বরং পূর্বাপেক্ষা বেশি আছে, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, বনী ফেরাসের বোন, এটি কী? তাঁর স্ত্রী বলেন, আমার চোখের স্নিগ্ধতার কসম! এটি তো পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ বেড়ে গেছে। অর্থাৎ খাবার এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) -ও সেখান থেকে খান এবং বলতে থাকেন, সে তো কেবল শয়তান ছিল, অর্থাৎ তার (শয়তানের) প্ররোচনায় আমি না খাওয়ার কসম খেয়েছিলাম। [প্রথমে কসম খেয়েছিলেন যে, আমি খাব না। কিন্তু যখন দেখেন, খাবারে বরকত হচ্ছে তখন তিনি বলেন, শয়তান আমার দ্বারা সেই কসম করিয়েছিল; এটি যেহেতু বরকতপূর্ণ খাবার তাই এটি থেকে আমিও খাব।] এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তা থেকে এক গ্রাস খান। অতঃপর তিনি (রা.) সেই খাবার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে যান আর তা মহানবী (সা.)-এর কাছে সকাল পর্যন্ত থাকে। [অর্থাৎ খাবার সকাল পর্যন্ত সেখানে থাকে।] তিনি বলেন, আমাদেরও এক গোত্রের মাঝে একটি চুক্তি ছিল যার মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই (গোত্রের) বারো ব্যক্তিকে আমরা পৃথক পৃথক বসতে দিই আর তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের সাথেই কয়েকজন লোক ছিল, অর্থাৎ সেই চুক্তিবদ্ধ লোকদের (মধ্য থেকে) বারো জন ছিল আর প্রত্যেকের সাথে আরো কয়েকজন ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন করে লোক ছিল, তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, তিনি (সা.) সেই লোকগুলোকে মানুষজনের সাথে পাঠিয়েছিলেন; [অর্থাৎ তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল।] হযরত আব্দুর রহমান বলতেন যে, তারা সবাই সেই খাবার থেকে খায়, অথবা অনুরূপ কিছুই বলেছিলেন। অতএব এরূপ বরকত আল্লাহ্ তা'লা একবার হযরত আবু বকর (রা.)-এর খাবারেও দান করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৫৮১)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে আজ কোনো দরিদ্রকে খাবার খাইয়েছে? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করলে এক ব্যক্তি আমার কাছে (খাবার) চায়, তখন আমি আব্দুর রহমানের হাতে রুটির একটি টুকরো (দেখতে) পাই, যা আমি তার কাছ থেকে নিয়ে নিই আর তা সেই অভাবীকে দিয়ে দিই।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৬৭০)

অর্থাৎ এভাবে এক অভাবী (খাবার) চেয়েছিল, আমার পুত্রের হাতে রুটি ছিল। আমি তার কাছ থেকে তা নিয়ে সেই অভাবীকে দিয়ে দিয়েছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-ও খিলাফতের যোগ্য ছিলেন আর লোকজন প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, তার প্রকৃতি হযরত উমর (রা.)-এর চেয়ে কোমল আর যোগ্যতাও তাঁর চেয়ে কম নয়; আপনার পর তারই খলীফা হওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের জন্য হযরত উমর (রা.)-কেই মনোনীত করেন, যদিও হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-এর প্রকৃতিতে ভিন্নতা ছিল। সুতরাং হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফত থেকে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থসিদ্ধি করেন নি, বরং সৃষ্টির সেবার মাঝেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব মনে করতেন।

সুফীদের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। (এ সম্পর্কে) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন এটি কতটুকু সঠিক! হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকরের ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করেন, সেই পু ণ্যকর্মগুলো কী কী যা তোমার মনিব করত? (তুমি বল) যেন আমিও সেগুলো করতে পারি। অন্যান্য পুণ্যকর্মের পাশাপাশি সেই ভৃত্য একটি কাজের কথা বলে আর সেটি হলো, হযরত আবু বকর প্রতিদিন রুটি বা খাবার নিয়ে অমুক দিকে যেতেন আর আমাকে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে তিনি সামনে চলে যেতেন। আমি এটি বলতে পারব না যে, তিনি কী উদ্দেশ্যে সেখানে যেতেন। এই কথা শোনার পর হযরত উমর (রা.) সেই ভৃত্যের সাথে খাবার নিয়ে সেই (স্থানের) দিকে চলে যান যার উল্লেখ সেই ভৃত্য করেছিল। সামনে গিয়ে তিনি দেখেন, এক গুহায় হাত -পা বিহীন একজন পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তি বসে আছে। হযরত উমর সেই পঙ্গু ব্যক্তির মুখে খাবারের একটি গ্রাস তুলে দিলে সে কেঁদে ফেলে আর বলতে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা আবু বকরের প্রতি কৃপা করুন, তিনি কতই না পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন! হযরত উমর (রা.) বলেন, বাবা! তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, আবু বকর মৃত্যুবরণ করেছেন? তখন সে বলে, আমার মুখে দাঁত নেই, তাই আবু বকর চিবিয়ে আমার মুখে গ্রাস তুলে দিতেন। আজ আমার মুখে শক্ত গ্রাস আসায় আমি বুঝতে পারি, এই গ্রাস মুখে তুলে দেওয়া ব্যক্তি আবু বকর নন, বরং অন্য কোনো ব্যক্তি। এছাড়া আবু বকর কখনো বিরতিও দিতেন না; এখন যেহেতু বিরতি হয়েছে, তাই নিশ্চিতরূপে তিনি এই পৃথিবীতে নেই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অতএব সেটি কী এমন জিনিস ছিল যা হযরত আবু বকর রাজত্বের মাধ্যমে অর্জন করেছেন? খিলাফত বা রাজত্ব যা তিনি পেয়েছিলেন তা থেকে তিনি কিছুই পান নি। তিনি কি সরকারী অর্থকে নিজের বলে ঘোষণা করেছেন আর রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পত্তি আখ্যা দিয়েছেন? কখনোই নয়। যেসব জিনিস তাঁর আত্মীয়স্বজন পেয়েছিল তা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে ছিল।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৯৪-৪৯৫)

তাঁর একমাত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা ছিল তা হলো সেই সেবা যা তিনি করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শরীয়তের দুটি অংশ রয়েছে, হাক্কুল্লাহ্ ও হাক্কুল ইবাদ। এদুটি জিনিসই রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য ও বান্দার অধিকার। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে দেখ, কীভাবে তিনি সেবামূলক কাজে জীবন অতিবাহিত করেছেন! আর হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থা দেখ! তিনি (কাপড়ে) এত বেশি তালি লাগিয়েছেন যে আর জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এক বৃদ্ধাকে সবসময় হালুয়া খাওয়ানো অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। লক্ষ্য করে দেখ, এটি কীরূপ অভ্যাস ছিল! যখন তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুবরণ করেন তখন সেই বৃদ্ধা বলে, আজ আবু বকর মৃত্যু বরণ করেছেন। তার প্রতিবেশীরা বলে, তোমার উপর কি এলহাম বা ওহী হয়েছে? তখন সে বলে, না, আজ তিনি হালুয়া নিয়ে আসেন নি, তাই বুঝতে পেরেছি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় এটি সম্ভব ছিল না যে, কোনো পরিস্থিতিতেই হালুয়া পৌঁছবে না। দেখ, কীরূপ সেবা ছিল! সবারই উচিত এভাবে সৃষ্টির সেবা করা।

(মালফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৪, ১৯৮৪)

তাঁর দোষত্রুটি আড়াল করার মান কেমন ছিল– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, আমি কোন চোর ধরলে আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা এটিই হতো যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার অপরাধ ঢেকে দেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯)

বীরত্ব ও সাহসিকতার ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) সাহসিকতা ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বড় বড় বিপদকেও তিনি ইসলামের খাতিরে অথবা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমের কারণে পরোয়াই করতেন না। মক্কার জীবনে যখনই তিনি মহানবী (সা.)-এর সত্তার জন্য কোনো বিপদ বা কষ্টের অবস্থা দেখতেন, তখনই তাঁর (সা.) সুরক্ষা ও সাহায্যের জন্য প্রাচীর হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন। শে'বে আবি তালেব-এ তিন বছর পর্যন্ত বন্দি ও অবরুদ্ধ থাকার যুগ এলে দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে সেখানেই উপস্থিত থাকেন। অতঃপর হিজরতের সময় মহানবী (সা.) -এর নৈকট্য ও সঙ্গ লাভের সম্মান লাভ করেন, অথচ এতে প্রাণের আশঙ্কা ছিল। যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সেগুলোতে হযরত আবু বকর (রা.) কেবল অংশগ্রহণই করেন নি বরং মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষার দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। তাঁর এই সাহসিকতা ও বীরত্বের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে হযরত আলী (রা.) একদা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, হে লোকেরা! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বীরপুরুষ কে? মানুষ উত্তরে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার কথা যদি বল, আমার সাথে যে সম্মুখ-যুদ্ধ করেছে তার সাথে আমি ন্যায়বিচার করেছি, অর্থাৎ তাকে হত্যা করেছি। কিন্তু সবার চেয়ে বীরপুরুষ হলেন হযরত আবু বকর (রা.)।

আমরা মহানবী (সা.)-এর জন্য বদরের দিন তাঁবু খাটাই, এরপর আমরা বলি, কে আছে যে মহানবী (সা.)-এর সাথে থাকবে যেন তাঁর (সা.) কাছে কোনো মুশরেক পৌঁছাতে না পারে? আল্লাহ্‌র কসম! তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে কেউ যায় নি, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নিজ তরবারি উঁচিয়ে মহানবী (সা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে যান। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে মোকাবিলা করার পূর্বে কোনো মুশরেকই মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছতে পারবে না। অতএব তিনিই হলেন সবার চেয়ে বীরপুরুষ।

অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-ই ভিড় ঠেলে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন।

বলা হয়ে থাকে, তখন হুযূর (সা.)-এর কাছে কেবল এগারো জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত সা'দ, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আবু দুজানা (রা.)-এর নামও পাওয়া যায়। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পাহারায় শিবিরে উপস্থিত কতিপয় নিবেদিত প্রাণ সাহাবীর মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-ও একজন ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাথে ছিলেন এবং পরিখা খননের সময় যারা নিজেদের কাপড়ে মাটি উঠিয়ে দূরে ফেলেছেন তিনি (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় প্রাণ বিসর্জনের উদ্দেশ্যে বয়আতকারী লোকদের মাঝে তিনি তো অন্তর্ভুক্ত ছিলেনই, সেইসাথে চুক্তিপত্র লেখার সময়ও হযরত আবু বকর (রা.) যে ঈমানী সাহসিকতা, অবিচলতা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা , আনুগত্য ও রসূল-প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা হযরত উমর (রা.) তার বাকি জীবনে ভুলতে পারেন নি।

তায়েফের যুদ্ধেও হযরত আবু বকর (রা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.)-ও অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই যুবক ছেলেএ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, পৃ: ৩৫৪,৩৬৭,৩৬৯,৩৭৬) (সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীক আকবার, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- মহম্মদ সালাবী, পৃ: ১০৭)

এরপর মহানবী (সা.) যখন ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন তখন মহানবী (সা.) বিভিন্ন সেনাপতি নিযুক্ত করে তাদেরকে পতাকা প্রদান করেন। এ সময় সবচেয়ে বড় পতাকা হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রদান করা হয়েছিল।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- উমর আবুন নাসার, পৃ: ৩৮১)

হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যেসব যুদ্ধাভিযান মহানবী (সা.) পরিচালনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে নয়টি যুদ্ধাভিযানে আমি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি; এগুলোতে আমাদের সেনাপতি কখনো হযরত আবু বকর (রা.) হতেন, আবার কখনো হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- উমর আবুন নাসার, পৃ: ৩৫৬)

এছাড়া মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর বলতে গেলে পুরো আরবই যখন মুরতাদ হয়ে যায় সেই অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যে সাহসিকতা ও বীরত্বের বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তার কোন তুলনাই নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার কাফেররা মহানবী (সা.)-এর গলায় পাগড়ির কাপড় পেঁচিয়ে সজোরে টানতে আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা জানতে পেরে দৌড়ে আসেন এবং সেই কাফেরদের তিনি দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেন, হে লোকেরা! তোমাদের কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই? তোমরা একজন মানুষকে কেবল এজন্য মারধর করছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রভু। তিনি তো তোমার কাছে কোনো সম্পত্তি চাচ্ছেন না, তাহলে তোমরা তাকে কেন মারছ?

সাহাবীরা বলেন, আমাদের যুগে আমরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি সাহসী জ্ঞান করতাম। কেননা শত্রু জানত যে, আমি যদি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে পারি তাহলে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। আর আমরা দেখেছি, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বদাই মহানবী (সা.)-এর পাশে দাঁড়াতেন যেন কেউ তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করলে তিনি (রা.) তাঁর সামনে নিজের বুক পেতে দিতে পারেন। বদরের যুদ্ধের সময় (মুসলমান বাহিনী যখন) কাফেরদের মুখোমুখি হয় তখন সাহাবীরা পরস্পর পরামর্শ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য একটি মাচা প্রস্তুত করে দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ র রসূল! আপনি এই মাচায় বসে আমাদের সফলতার জন্য দোয়া করুন। শত্রুদের সাথে আমরা নিজেরা লড়াই করব। এরপর তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যদিও আমাদের মাঝে নিষ্ঠা রয়েছে, তথাপি যারা মদীনায় অবস্থান করছে তারা আমাদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠাবান ও ঈমানদার। কাফেরদের সাথে যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে তা তারা জানতো না, জানলে তারাও এই যুদ্ধে অবশ্যই অংশ নিত। রীতিমত বদরের যুদ্ধের কথা তারা জানত না, অন্যথায় তারাও অংশগ্রহণ করত।

হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌না করুন, এ যুদ্ধে যদি আমাদের পরাজয় হয় সেক্ষেত্রে একটি দ্রুতগতির উটনী আপনার কাছে বেঁধে রেখেছি আর হযরত আবু বকর (রা.) -কে আপনার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমাদের মাঝে তার চেয়ে সাহসী ও বীরপুরুষ আর কাউকে আমরা দেখি না। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অতি দ্রুত আবু বকরের সাথে এই উটনীতে চড়ে মদীনায় যাবেন এবং কাফেরদের সাথে মোকাবিলার জন্য সেখান থেকে এক নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবেন যারা আমাদের চেয়েও নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনা থেকে অনুমান কর যে, হযরত আবু বকর (রা.) কত বড় আত্মত্যাগী মানুষ ছিলেন!"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৯, পৃ:২২০-২২১)

আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার কিছু লোক সাহাবীদের জিজ্ঞেস করে, মহানবী (সা.)-এর যুগে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীর কে ছিলেন? বর্তমানে যেভাবে শিয়া ও সুন্নির বিষয়টি রয়েছে ঠিক একইভাবে সে যুগেও যারা পক্ষ অবলম্বন করত তারা তাঁর প্রশংসা বা বন্দনা করত। সাহাবীদের এই প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তারা বলেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীর তাকে জ্ঞান করা হতো যিনি সর্বদা মহানবী (সা.) এর পাশে দণ্ডায়মান থাকতেন। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি কেবল একজন যোদ্ধাই বুঝতে পারে, অন্য সাধারণ মানুষ বুঝবে না। যুদ্ধের সঠিক জ্ঞান যে রাখে এবং যুদ্ধের বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত, সে-ই অনুমান করতে পারে যে, যেখানে সবচেয়ে বেশি বিপদের আশঙ্কা থাকে সেখানে দাঁড়ানো কতটা সাহস ও বীরত্বের কাজ। তিনি (রা.) বলেন, মূলকথা হলো, যে ব্যক্তি দেশ ও জাতির প্রাণ হয়ে থাকেন শত্রু তাকে হত্যা করতে চায়, যেন তার মৃত্যুর সাথে সমস্ত বিবাদ মিটে যায়। এজন্য যেখানেই এমন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হবে সেখানেই শত্রুপক্ষ পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে আক্রমণ করবে। কোনো জিনিসের প্রাণকেন্দ্রের ওপরই শত্রুরা বেশি আক্রমণ করে আর এমন স্থানে সে ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হতে পারে, অর্থাৎ সেই প্রাণকেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য সে ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হতে পারে যে সবচেয়ে বেশি বীরত্বের অধিকারী এবং সাহসী। এরপর সাহাবীরা বলেন, মহানবী (সা.)-এর পাশে অধিকাংশ সময় আবু বকর (রা.) দাঁড়াতেন আর আমাদের দৃষ্টিতে তিনিই সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন।"

(তফসীরে কবীর, ১০ খণ্ড, পৃ: ৩৬৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূ রা বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে আরো বলেন, এ বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ***'আসরা বি আবদিহি'*** আয়াত থেকে বুঝা যায়, পরিচালক অন্য কেউ ছিলেন আর তাতে যাত্রীর নিজের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। হিজরতের ঘটনাও এভাবেই ঘটেছে, অর্থাৎ তিনি (সা.) রাতেই বেরিয়েছিলেন আর এই বের হওয়াও নিজের ইচ্ছাধীন ছিল না, বরং তখন তিনি (সা.) বাধ্য হয়ে বের হন যখন কাফেররা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। অতএব এই সফরে তাঁর (সা.) নিজস্ব কোনো ইচ্ছা ছিল না বরং খোদা তা'লার ইচ্ছাই তাঁকে বাধ্য করেছিল, অর্থাৎ তাঁকে যিনি পরিচালনা করেছেন, তাঁকে যিনি বের করেছেন এবং তাঁকে যিনি হিজরত করতে বলেছেন তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ , আর তাঁর ইচ্ছার জন্যই তিনি (সা.) বাধ্য হয়ে বের হয়েছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অপরদিকে যেভাবে স্বপ্নে জিব্রাঈল

বায়তুল মুকাদ্দাসের সফরে তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন তেমনিভাবে আবু বকর (রা.) হিজরতে তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। তিনি (রা.) বলতে গেলে সেভাবেই তাঁর অনুগত ছিলেন যেভাবে জিব্রাঈল আল্লাহ্ তা'লার অনুগত হয়ে কাজ করেন। এছাড়া জিব্রাঈলের অর্থ খোদা তা'লার পালোয়ান বা বীর। হযরত আবু বকর (রা.)-ও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দা ছিলেন এবং ধর্মের খাতিরে এক নির্ভীক বীরের মর্যাদা রাখতেন।" (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার কালাম তথা বাণীর প্রতি ঈমান থাকা অবস্থায় মানব হৃদয়ে নৈরাশ্য সৃষ্টিই হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান থাকলে হৃদয়ে কোনো নৈরাশ্য সৃষ্টি হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ সওর গুহায় মহানবী (সা.)-এর যে অবস্থা হয়েছিল সেখানে আর কোন্ আশার আলো অবশিষ্ট ছিল? মহানবী (সা.) রাতের আঁধারে নিজ বাড়ি ছেড়ে সওর গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। এমন একটি গুহা যার মুখ বেশ প্রশস্ত ও খোলা ছিল আর যেকোন মানুষ সহজেই এর ভেতরে উঁকি দিতে পারত এবং লাফিয়ে পড়তে পারত। কেবলমাত্র একজন সাথি তাঁর সাথে ছিল এবং তাঁরা উভয়েই ছিলেন নিরস্ত্র ও বলহীন। মক্কার অস্ত্রধারী লোকেরা তাঁর (সা.) পশ্চাদ্ধাবন করে সওর গুহায় পৌঁছে আর তাদের কেউ কেউ জোরাজুরি করে বলেছে, আমাদের উঁকি দিয়ে হলেও ভিতরে একবার দেখে নেওয়া উচিত যেন এর ভিতরে তারা থাকলে আমরা তাদের পাকড়াও করতে পারি। শত্রুকে এত কাছে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন আর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্'র রসূল (সা.)! শত্রু তো আমাদের নাকের ডগায় পৌঁছে গেছে। তিনি (সা.) তখন অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (সূরা তওবা : ৪০) অর্থাৎ হে আবু বকর! তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। দেখুন, তিনি কীরূপ চরম বিপদসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন! আর এ ঘটনার পর মহানবী (সা.)-কে হত্যা বা গ্রেফতার করার চেষ্টায় আর কী ত্রুটি অবশিষ্ট ছিল? কিন্তু যদিও শত্রু শক্তিধর ছিল, সৈন্যসামন্ত তাদের সাথে ছিল এবং তাদের কাছে অস্ত্রসস্ত্র ছিল, অথচ মহানবী (সা.) ছিলেন একেবারে নিরস্ত্র আরকেবল একজন সাথি নিয়ে গুহায় বসে ছিলেন; তাঁর সাথে অস্ত্র ছিল না, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর পক্ষে ছিল না আর কোনো লোকবলও তাঁর সাথে ছিল না; বহু সংখ্যক শত্রুকে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও তিনি (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا তুমি কেন একথা বলছ যে, শত্রু শক্তিধর? তারা কি খোদার চেয়ে অধিক শক্তিধর? যেখানে খোদা তা'লা আমাদের সাথে আছেন তখন আমাদের ভয়ের কী কারণ আছে? হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভীতিও নিজের জন্য ছিল না, বরং মহানবী (সা.)-এর জন্য ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কতক শিয়া এই ঘটনা উপস্থাপন করে বলে, [নাউযুবিল্লাহ্ ,] আবু বকরের ঈমান ছিল না; সে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিতে ভয় পেয়েছিল। অথচ ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) যখন বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল(সা.)! আমি নিজ প্রাণের জন্য ভীত নই। আমি যদি মারা যাই তবে কেবল একজন ব্যক্তি মারা যাবে ;আমি তো আপনার প্রাণ নিয়ে শঙ্কিত, কেননা আপনার কোনো ক্ষতি হলে জগত থেকে সত্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৮, পৃ: ৪১৬-৪১৭)

অপর একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ বিষয়টি কেবল নবীদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং এর বাইরেও বিভিন্ন যুগে এমন লোক দেখা যায়, যারা নিজ নিজ যুগে এমন কাজ করেছেন যা তারা ছাড়া অন্য কেউ করতে পারত না।

যেমন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথাই ধরুন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ব্যাপারে কেউ একথা চিন্তাও করত না যে, তিনিও কোনো এক যুগে নিজ জাতির নেতৃত্ব দিবেন। সাধারণত এটিই মনে করা হতো যে, তিনি দুর্বল প্রকৃতির, শান্তি প্রিয় এবং কোমল স্বভাবের মানুষ। মহানবী (সা.)-এর যুগের যুদ্ধগুলোকেই দেখুন। তিনি (সা.) কোনো বড় যুদ্ধেই হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন নি। নিঃসন্দেহে কতক এমন ছোট ছোট যুদ্ধাভিযান ছিল যেগুলোতে তাঁকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু বড় বড় যুদ্ধে সব সময়ই অন্যদেরকে সেনাপতি করে প্রেরণ করা হতো। অনুরূপভাবে অন্যান্য কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হতো না। বাকি থাকল পবিত্র কুরআন শেখানো বা বিচার বিষয়ক কাজ- এগুলোর দায়িত্বও তাঁর স্কন্ধে অর্পণ করা হয় নি। [অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করা হয় নি।] কিন্তু মহানবী (সা.) জানতেন, যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগ আসবে, তখন যে কাজ হযরত আবু বকর (রা.) করতে পারবেন তা তিনি (রা.) ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না। অতএব মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় যে, কে খলীফা হবে- তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাথায়ও এ বিষয়টি ছিল না যে, তিনিই খলীফা হবেন। তিনি (রা.) মনে করতেন, হযরত উমর প্রমুখই (খিলাফত)-এর যোগ্য বা তারাই খলীফা হতে পারেন। কিন্তু আনসারের মাঝে যখন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তারা চান, খিলাফত যেন তাদের মাঝেই থাকে; কেননা তারা মনে করতেন, আমরা ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং এখন খিলাফতের অধিকার (আনসাররা মনে করতেন) আমাদের; অপরদিকে মুহাজেররা বলছিলেন, খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে। মোটকথা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুতে একটি বিবাদের সৃষ্টি হয়। আনসাররা বলছিলেন, খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে আর মুহাজেররা বলছিলেন, খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে। অবশেষে বিতর্কের অবসানের লক্ষ্যে আনসারের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, একজন খলীফা মুহাজেরদের মধ্য থেকে হোক এবং একজন খলীফা আনসারের মধ্য থেকে হোক। এই বিতর্কের অবসানের জন্য একটি সভা আহ্বান করা হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি ভাবলাম, নিঃসন্দেহে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান ও বুযুর্গ ব্যক্তি, কিন্তু এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা তাঁর কাজ নয়, এটি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। হযরত উমর (রা.) ভাবেন, এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা যদি কারো পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে আমিই সেই ব্যক্তি। এখানে বল প্রয়োগ করা আবশ্যক, নম্রতা ও ভালোবাসা দিয়ে কাজ হবে না। হযরত আবু বকর (রা.) তো নম্রতা ও ভালোবাসা দেখানোর মানুষ। তাই তিনি বলেন, আমি ভেবেচিন্তে এমন সব যুক্তিপ্রমাণ বের করতে আরম্ভ করি যেগুলো দ্বারা একথা সাব্যস্ত হবে যে, খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত । অপরদিকে একজন খলীফা আনসারদের মধ্য থেকে হোক এবং একজন মুহাজেরদের মধ্য থেকে হোক- এটি সম্পূর্ণ ভুল (প্রস্তাব)। তিনি বলেন, আমি অনেক যুক্তিপ্রমাণ ভেবে বের করি, তারপর সেই সভায় যাই যা এই বিতর্কের অবসানের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ও আমার সাথে ছিলেন। আমি ভাবছিলাম যে, আমি বক্তৃতা দিব এবং যেসব যুক্তিপ্রমাণ আমি ভেবে রেখেছি সেগুলো দিয়ে লোকজনকে আমার সাথে সহমত করে নেব। আমি ভাবতাম, এই সভায় বক্তব্য রাখার মত যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতাপের অধিকারী হযরত আবু বকর (রা.) নন। হযরত উমর (রা.) বলেন, কিন্তু যেই না আমি উঠে দাঁড়াতে যাব, ঠিক তখনই হযরত আবু বকর (রা.) কিছুটা রাগের সাথে করাঘাত করে আমাকে বলেন, বসে পড়! আর তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি যতগুলো যুক্তিপ্রমাণ ভেবেছিলাম সেগুলোর সবই হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আর এছাড়াও আরো অনেক যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরতে থাকেন এবং এভাবে বলতেই থাকেন। এভাবে এক পর্যায়ে আনসাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং তারা মুহাজেরদের খিলাফতের নীতি মেনে নেন।

ইনিই সেই আবু বকর (রা.) ছিলেন যাঁর সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার কোনো বিবাদের সময় বাজারে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এবং তাঁর গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হয়েছিলেন। ইনিই সেই আবু বকর (রা.) যাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আবু বকরের হৃদয় খুবই কোমল। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয় তখন মৃত্যুর পূর্বে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, আমার মনে বার বার এই ইচ্ছা জাগে যে, লোকজনকে বলে দিই, তারা যেন আমার (মৃত্যুর) পর আবু বকরকে খলীফা বানায়; কিন্তু আবার আমি থেমে যাই কারণ আমার মন জানে, আমার মৃত্যুর পর খোদা তা'লা এবং তাঁর মু'মিন বান্দারা আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা বানাবেন না।বাস্তবে এমনটিই হয়েছে, তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এবং এতটা নম্র স্বভাবের ছিলেন যে, একদা হযরত উমর (রা.) তাঁকে বাজারের ভেতর মারতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং তাঁর কাপড় তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই আবু বকর (রা.)-ই যাঁর নম্রতার এরূপ অবস্থা ছিল, এমন এক যুগ আসে যখন হযরত উমর (রা.) তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন, সমগ্র আরব এখন বিরোধী হয়ে গিয়েছে; শুধুমাত্র মদীনা, মক্কা ও আরেকটি ছোট জনপদে বাজামা'ত নামায পড়া হয়, বাকি সবাই নামায পড়লেও তাদের মধ্যে এতটা বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে, একজন আরেকজনের পেছনে নামায পড়তে প্রস্তুত নয়। এছাড়া মতবিরোধ এতটা বেড়ে গেছে যে, তারা কারো কথা মানতে প্রস্তুত নয়। আরবের মূর্খ লোকেরা যারা মাত্র পাঁচ-ছয়মাস পূর্বে মুসলমান হয়েছে তারা দাবি করছে যে, যাকাত বিলোপ করে দেওয়া হোক। হযরত উমর (রা.) বলেন, এসব মানুষ যাকাতের বিষয়টি ভালোভাবে বোঝেও না, তাই এক-দুই বছর তাদের যাকাত মওকুফ করে দেওয়া হলে তাতে সমস্যা কোথায়? সেই উমর(রা.) যিনি সর্বদা তরবারি হাতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং ছোটোখাটো বিষয়েও বলতেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! অনুমতি পেলে তার শিরোশ্ছেদ করে দিব- তিনি তাদের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হন এবং এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হন যে, আবু বকর (রা.)-এর নিকট এসে তাঁর কাছে নিবেদন করেন, এসব অজ্ঞ লোকের যাকাত কিছু দিনের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হোক; আমরা ধীরে ধীরে তাদের বুঝিয়ে নিব। কিন্তু সেই আবু বকর (রা.) যিনি এতটা কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে হযরত উমর (রা.) বলেন, একবার আমি তাকে মারতে উদ্যত হয়েছিলাম এবং বাজারের মধ্যে তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম; তিনি (রা.) তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উমরের দিকে তাকান, [অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) যখন একথা বলেন যে,যারা বিদ্রোহ করছে তাদের যেন কিছু না বলা হয়, দুই বছর পর্যন্ত যেন তাদের কাছ থেকে যাকাত না নেওয়া হয়; পরবর্তীতে

আমরা তাদের বুঝিয়ে নিব।] হযরত উমর (রা.) যখন এ বিষয়ে কথা বলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত রাগত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, উমর! তুমি সেই বিষয়ের দাবি করছ যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল করেন নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা ঠিক, কিন্তু এরা এক কথার মানুষ। শত্রুসেনা মদীনার সীমানায় পৌঁছে গেছে। এসব লোক আরো এগিয়ে আসুক এবং দেশের মধ্যে আবারও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক– এটি কি ঠিক হবে, নাকি তাদের যাকত এক–দুই বছরের জন্য মাফ করে দেওয়া সঙ্গত হবে? নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নাকি কোনোভাবে সন্ধি করে নেওয়া সঠিক হবে? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! শত্রুরা যদি মদীনার ভেতর ঢুকে যায় এবং এর অলিগলিতে মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় আর মহিলাদের লাশগুলোকে কুকুর টানাহেঁচড়া করে, তবুও আমি তাদের যাকাত মাফ করব না। খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যুগে এরা যদি যাকাত হিসেবে রশির একটি টুকরোও প্রদান করে থাকে তাহলে আমি তা–ও তাদের কাছ থেকে নিয়ে ছাড়ব।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, হে উমর! তোমরা যদি ভয় পাও তবে নিঃসন্দেহে চলে যাও। আমি একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব আর ততক্ষণ পর্যন্ত থামব না যতক্ষণ না তারা তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিবৃত্ত হবে। অতএব যুদ্ধ হয় এবং তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) জয়ী হন আর নিজ মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেই তিনি পুনরায় সমগ্র আরবকে নিজের অধীনস্থ করে নেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর জীবনে যেসব কাজ করেছেন তা তাঁরই ভাগ্যে ছিল, অন্য কেউই সেই কাজ করতে পারত না। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড–৩০, পৃ: ১৯৮–২০০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জনসাধারণের কাছে মক্কার সর্দারদের এতটা সম্মান ও মর্যাদা ছিল যে, সাধারণ মানুষ তাদের সম্মুখে কথা বলতেও ভয় পেত। এছাড়া জনসাধারণের প্রতি তাদের অনুগ্রহও এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, কোনো ব্যক্তি তাদের সম্মুখে চোখ তুলেও তাকাতে পারত না। তাদের প্রতাপ সম্পর্কে তখন বুঝা যায় যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মক্কাবাসী যে সর্দারকে মহানবী(সা.)–এর সাথে আলোচনা করতে পাঠিয়েছিল সে কথা বলতে বলতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পবিত্র দাড়িতে হাত দেয়। এ দৃশ্য দেখে একজন সাহাবী তার তরবারির বাট, অর্থাৎ তরবারির হাতল দিয়ে সজোরে তার হাতে আঘাত করে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পবিত্র দাড়ি তোমার অপবিত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না। সে চোখ তুলে দেখে যেন সে চিনতে পারে যে, কে এই ব্যক্তি যে আমার হাতে তরবারির হাতল দিয়ে আঘাত করেছে। সাহাবা (রা.) যেহেতু শিরোস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন এজন্য তাদের কেবল চোখ এবং এর আশপাশ দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ ভাল করে দেখার পর সে বলে ওঠে, তুমি কি অমুক ব্যক্তি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সে বলে, তুমি কি জান না যে, অমুক অমুক সময়ে আমি তোমার পরিবারকে অমুক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি এবং অমুক সময়ে তোমার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছি? (এরপরও) তুমি আমার সম্মুখে কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাও? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আমরা যদি আজকাল লক্ষ্য করি তাহলে অকৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য মানুষের মাঝে এতটা বিস্তার লাভ করেছে যে, সন্ধ্যায় কারো প্রতি কোনো অনুগ্রহ করলে সকালেই সে তা ভুলে যায় আর বলে, এখন কি আমি সারা জীবন তার গোলাম হয়ে থাকব? আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে তো কী হয়েছে? সারা জীবনের দাসত্ব তো দূরের কথা, অনুগ্রহের জন্য এক রাত কৃতজ্ঞ হওয়াই দুষ্কর। কিন্তু আরবদের মাঝে চরম পর্যায়ের কৃতজ্ঞতাবোধের চেতনা পাওয়া যেত। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময় ছিল, কিন্তু সে যখন তার প্রতি করা অনুগ্রহের তালিকা বর্ণনা করে তখন সেই সাহাবীর দৃষ্টি নীচু হয়ে যায় এবং তিনি লজ্জিত হয়ে পেছনে চলে যান। [তখন এত বেশি অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা হতো।] ফলে সে আবার মহানবী (সা.)–এর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করে আর বলে, আমি আরবের পিতা! আমি তোমার কাছে মিনতি করছি যে, তুমি তোমার জাতির সম্মান রক্ষা কর। আর দেখ! তোমার আশেপাশে যারা সমবেত রয়েছে তারা তো বিপদের সময় তাৎক্ষণিকভাবে পলায়ন করবে। তোমার জাতিই শেষ পর্যন্ত তোমার উপকারে আসবে। অতএব নিজ জাতিকে লাঞ্ছিত করছ কেন? আমি আরবের পিতা। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)–কে বার বার একথাই বলছিল যে, আমি আরবের পিতা, তুমি আমার কথা মেনে নাও আর আমার কথা মতো উমরা না করেই ফিরে চলে যাও। এরই মাঝে সে তার কথায় জোর দিতে এবং মহানবী (সা.) –কে দিয়ে (কথা) মানানোর জন্য তাঁর পবিত্র দাড়িতে আবার হাত দেয়। যদিও তাঁর পবিত্র দাড়িতে তার হাত লাগানো নিবেদনস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ অত্যন্ত মিনতির সুরে বলতে চাচ্ছিল আর এজন্য তা করছিল যেন তাঁকে দিয়ে নিজের কথা মানাতে পারে। কিন্তু এতে যেহেতু অসম্মানের দিকও নিহিত ছিল, তাই সাহাবীরা (রা.) এটি সহ্য করতে পারেন নি। আর যখনই সে মহানবী (সা.)–এর দাড়িতে হাত দিয়েছে তখনই কোনো এক ব্যক্তি নিজ হাত দিয়ে তার হাতে (ধাক্কা) মেরে বলেন, (সাবধান!) তোমার নোংরা হাত রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পবিত্র দাড়ির দিকে বাড়াবে না। সে আবার চোখ তুলে গভীরভাবে দেখতে থাকে যে, কে সেই ব্যক্তি যে আমাকে বাধা দিয়েছে? অবশেষে সে তাকে চিনতে পেরে নিজের দৃষ্টি অবনত করে নেয়। কাফেরদের প্রতিনিধি হয়ে যে ব্যক্তি এসেছিল সে ওই ব্যক্তিকে চেনার পর দৃষ্টি অবনত করে ফেলে।

সে দেখে, ইনি তো আবু বকর (রা.); আর সে বলে ওঠে, হে আবু বকর! আমি জানি, তোমার প্রতি আমার কোনো অনুগ্রহ নেই। তুমিই এমন একজন মানুষ যার প্রতি আমার কোনো অনুগ্রহ নেই।

অতএব তারা অন্যদের প্রতি অনুগ্রহকারী এমন এক জাতি ছিল যারা হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত যতজন আনসার ও মুহাজের সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের সবার ওপর এক গোত্রপতির কোনো না কোনো অনুগ্রহ ছিল, আর হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত অন্য কারো এমন সাহস ছিল না যে, তার হাতকে প্রতিহত করতে পারে। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড–২০, পৃ: ৪৮৪–৪৮৫)

তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যার প্রতি তার কোনো অনুগ্রহ ছিল না।

পুনরায় আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যাকাত এমন একটি আবশ্যক বিষয় যে, কেউ না দিলে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) –এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.)–এর যুগে কিছু লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (সূরা তওবা : ১০৩)– এ আয়াতে তো মহানবী (সা.)–কে বলা হয়েছে, তুমি নাও। এখন যেহেতু মহানবী (সা.) আর বর্তমান নেই তখন আর কে (এটি) নিতে পারে? অজ্ঞরা এটি বুঝতে পারে নি যে, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি (তা) নেবেন। কিন্তু অজ্ঞতাবশত তারা বলে দিয়েছে, আমরা যাকাত দিব না। একদিকে লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, অন্যদিকে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রায় সমগ্র আরব মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে এবং কয়েকজন নবীর দাবিদার দাঁড়িয়ে গেছে। এরূপ অনুভূত হচ্ছিল যেন (নাউযুবি ল্লাহ্) ইসলাম ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে। এমন স্পর্শকাতর সময়ে সাহাবীরা হযরত আবু বকর (রা.)–কে বলেন, যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আপনি তাদের সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে নমনীয় আচরণ করুন। হযরত উমর (রা.) যাকে অনেক সাহসী আখ্যা দেওয়া হয় তিনি বলেন, আমি যত বড় বীরই হই না কেন, আবু বকর (রা.)–এর মত নই। কেননা আমিও তখন একথাই বলেছিলাম যে, তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা হোক; প্রথমে কাফেরদের নিধন করে তারপর তাদের সংশোধন করব। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আবু কাহাফার পুত্রের ধৃষ্টতা কোথায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রবর্তিত নির্দেশ পরিবর্তন করবে! আমি তো এসব লোকের সাথে ততক্ষণ লড়াই করব যতক্ষণ তারা পূর্ণ হারে যাকাত না দেবে এবং মহানবী (সা.)–এর যুগে উঁট বাঁধার একটি রশি দিয়ে থাকলে তা–ও না দিবে বা আদায় করবে।

তখন সাহাবীরা বুঝতে পারেন, খোদার মনোনীত খলীফা কতটা সাহস এবং বীরত্বের অধিকারী হন। পরিশেষে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের অধীনস্থ করেন এবং তাদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে ছাড়েন।"

(ইসলাহে নফস, আনোয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২)

হযরত আবু বকর (রা.)–এর আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে জনৈক লেখক লেখেন, হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুসলমান হন তখন তাঁর কাছে ৪০ হাজার দিরহামের মোটা অঙ্কের অর্থ জমা ছিল ; আর এটি জানা কথা যে, ব্যবসায়িক মূলধন তথা উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রী এর বাইরে ছিল। বরং একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর কাছে এক মিলিয়ন, অর্থাৎ দশ লক্ষ দিরহাম জমা ছিল। তিনি মক্কায় সাধারণ মু সলমানদের সাহায্য–সহযোগিতায় এবং দরিদ্র মুসলমানদের ভরণ পোষণের জন্য হাজার হাজার দিরহাম ব্যয় করেন। তথাপি তিনি যখন হিজরত করেন তখন তাঁর সাথে নগদ পাঁচ–ছয় হাজার দিরহাম ছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি (রা.) এই সমস্ত অর্থ মহানবী (সা.)–এর প্রয়োজন মেটানোর জন্য জমা করে রাখছিলেন এবং হিজরতের সময় মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন। এই অর্থ দিয়েই তিনি (আ.) হিজরতের সময় সফরের ব্যয় নির্বাহ করা ছাড়াও হিজরতের পর মহানবী (সা.)–এর পরিবারের কতক সদস্যের সফরের খরচ হিসেবে দিয়েছিলেন এবং মদীনায় মুসলমানদের জন্য কিছু জমিও ক্রয় করেছিলেন।

(ডক্টর মহম্মদ হুমাউন আব্বাস শামস–এর রচনা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৩–৪৩৪)
(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যে অসুস্থতায় মহানবী (সা.)–এর মৃত্যু হয় সেই অন্তিম অসুস্থতার সময় তিনি (সা.) বাইরে বেরিয়ে আসেন আর তিনি (সা.) তাঁর মাথা একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন, লোকদের মাঝে এমন কেউ নেই যে তার নিজ জীবন ও সম্পদের মাধ্যমে আমার সাথে আবু বকর বিন আবু কাহাফার চেয়ে অধিক উত্তম আচরণ করেছে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস–৪৬৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কোনো সম্পদই আমার ততটা উপকার সাধন করে নি যতটা উপকার করেছে আবু বকরের সম্পদ। রেওয়ায়াতকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি এবং আমার সম্পদ তো কেবল আপনার জন্যই নিবেদিত।

(সুনান ইবনে মাজা, বাব ফি ফাযাইলি আসহাব, হাদীস–৯৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,এক যুদ্ধকালীন সময় সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হলো, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বদা আমার

আল্লাহু আকবর! এই দুজন, অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কত মহান! এ দুজনই এমন এক কল্যাণমণ্ডিত সমাধিস্থলে দাফন হয়েছেন, মূসা ও ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা শত চেষ্টা করে হলেও সেখানে সমাধিস্থ হওয়ার বাসনা করতেন।

**প্রথম খলীফার স্মৃতি মুসলমানদের মাঝে সর্বদা এমন এক ব্যক্তি হিসেবে জাগ্রত রয়েছে যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ত, দয়া ও অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক এবং কোনো তীব্র থেকে তীব্র ঝড়ও তাঁর স্থায়ী সহনশীলতাকে টলাতে পারে নি।**

**'মুহাম্মদ (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন আবু বকর তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হন এবং পাহাড় টলানো ঈমান নিয়ে তিনি অত্যন্ত সরলতা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তিন অথবা চার হাজার আরব সংবলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনকারী বানানোর কাজ আরম্ভ করেন।'** (এইচ.জে. ওয়েলস)

"তিনি (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গৃহের সেবক হয়ে গিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গৃহের সেবক হয়ে গিয়েছেন তঁ ার প্রত্যেকটি জিনিসই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে গিয়েছে। এখন এটি সম্ভবই নয় যে, কেউ আমাদের হৃদয় থেকে এই শ্রেষ্ঠত্ব মিটিয়ে দিতে পারে। "

**আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, নাউযুবিল্লাহ্ আমরা মহানবী (সা.)-এর অসম্মান করি; অথচ এই হলো আমাদের চিন্তাচেতনা।**

## আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

**"মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে কোনো তর্ক করেন নি, কোনো নিদর্শন বা মু'জিযা দেখতে চান নি; দাবির কথা শোনার পর শুধু এটুকুই জানতে চেয়েছেন যে, আপনি কি নবুয়্যতের দাবি করছেন? রসূলুল্লাহ্ (সা.) 'হ্যাঁ' বলার সাথে সাথেই তিনি (রা.) বলে ওঠেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি সবার আগে ঈমান আনছি।"**

**একজন মু'মিন কি ভাবতে পারে, ইসলামের সূচনা হয়েছে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে যে একজন কাফির ও অভিশপ্ত ছিল? এছাড়া রসূলদের গর্ব মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম যে হিজরত করেছে সে কাফির ও মুরতাদ ছিল! এভাবে এসব কথা মেনে নিলে তো সকল শ্রেষ্ঠত্ব কাফিরদের ঝুলিতেই চলে যায়! এমনকি পুণ্যবানদের সর্দার মুহাম্মদ (সা.)-এর কবরের নৈকট্যও।"**

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২ ডিসেম্বর ২০২২, এর জুমুআর খুতবা ( ২ ফাতাহ, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছিল। এরইধারাবাহিকতায় মানুষের মাঝে তাঁর সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় হওয়ার ব্যাপারে লিখিত আছে,হযরত ইবনে উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আমরা মানুষের মাঝে একজনকে আরেকজনের চেয়ে উত্তম আখ্যা দিতাম। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা হতো যে, কে অপরের চেয়ে উত্তম। আর তখন (আমরা) মনে করতাম, হযরত আবু বকর (রা.) সবার চেয়ে উত্তম। এরপর (হলেন) হযরত উমর বিন খাত্তাব আর তারপর হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)। (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৫৫)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর মানুষের মধ্যের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি! অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রশংসা করেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যদি একথা বল তাহলে (শোন!) মহানবী (সা.)-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, এমন কোনো মানুষের জন্য সূর্য উদিত হয় নি যে উমরের চেয়ে উত্তম।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭৪)

অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বলেন, আমাকে তুমি অন্যের চেয়ে উত্তম বলছ, অথচ আমি তো তোমার সম্পর্কেও মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, তুমি উত্তম।আব্দুল্লাহ্ বিন শফীক বর্ণ না করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে জানতে চাই, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। আমি জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.)। আমি বলি, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপর হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.)। তিনি বলেন, আমি পুনরায় জানতে চাই, এরপর কে? তখন তিনি নিশ্চুপ থাকেন।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৫৭)

মুহাম্মদ বিন সিরীন (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)'র সমালোচনা করে, অর্থাৎ তাঁদের মাঝে দোষত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করে, আমি মনে করি না যে, সে মহানবী (সা.)-কেও ভালোবাসে।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭৫)

অর্থাৎ একই সাথে এই দাবিও করে যে, আমি মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসি। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র মাঝে দুর্বলতা খোঁজার চেষ্টা করার পর এ দাবি করা ভুল যে, তারা মহানবী (সা.)-কেও ভালোবাসে, কেননা তাদের উভয়েই মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন।

হযরত আয়েয বিন আমর (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সালমান, হযরত সুহায়েব ও হযরত বেলাল (রা.) কতিপয় লোকের মাঝে বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান আসে। তখন তারা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে আল্লাহ্‌র তরবারির হিসাবনিকাশ এখনও বাকি আছে। অর্থাৎ সঠিকভাবে যে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ছিল তা এখনও নেওয়া হয় নি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন,তোমরা কি কুরাইশের বড় বড় নেতাদের সম্পর্কে এমন কথা বলছ! আবু সুফিয়ানও কুরাইশের সর্দারদের একজন। তোমরা বলছ, আমরা তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিই নি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) নিজে মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তুমি হয়ত তাদেরকে, অর্থাৎ সালমান, সুহায়েব ও বেলালকে অসন্তুষ্ট করেছ। আর তুমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাকলে ধরে নিও যে, তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) সেই তিনজনের কাছে এসে বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা কি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন? একান্ত ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে তিনি একথা বলেন। তখন তারা বলেন, না, (এটি) এমন কোনো বিষয় নয়। হে আমাদের ভ্রাতা! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৬৪১২)

যাইহোক, এখানে এটি প্রমাণ করাও উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র বিনয় কী মানের ছিল! তারা এমন লোক যাদেরকে তিনি (রা.) দাসত্ব থেকে মুক্তও করিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের নিকট এসে তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের কী মান ছিল (দেখুন)! মহানবী (সা.) যখন একথা বলেন যে, তুমি (তাদেরকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তিনি (সা.) বলেন নি, যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও। কিন্তু তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ স্বয়ং(তাদের নিকট) যান এবং তাদের কাছে ক্ষমা চান। এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে (এর)ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, এই ঘটনা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কাফিরদের যুদ্ধবিরতির চুক্তির পরের ঘটনা, আবু সুফিয়ান তখনো মুসলমান হয় নি। ওই সময় মুসলামানদের ধারণা ছিল, আমরা তাদেরকে পূর্বেই কেন হত্যা করলাম না! (সহীহ মুসলিম, শারাহ আন নওদা, পৃ: ৯৬)

পবিত্র কুরআন হিফয বা মুখস্থ করা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও ইতিহাসের বরাতে কিছু কথা বলেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আবু উবায়দা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মুহাজের সাহাবীদের মাঝে নিম্নোক্তদের হাফেয হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত:-হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, সা'দ, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা, সালেম, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ বিন সায়েব, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) আর নারীদের মাঝ থেকে হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.)। এদের অধিকাংশই মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় পবিত্র কুরআন হিফয বা মুখস্থ করে নিয়েছিলেন,আর কতক তাঁর (সা.) তিরোধানের পর মুখস্থ করেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল্ উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪২৯-৪৩০)

'সানিয়াসনাইন' তথা 'দুজনের মাঝে দ্বিতীয়'- এ বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'রনিজের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আনাস হযরত আবু বকরের বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলি আর তখন আমি গুহায় ছিলাম; অর্থাৎ হযরত আবু বকর যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে গুহায় ছিলেন তখন তিনি বলেন, তাদের কেউ যদি তাদের পায়ের নীচে দৃষ্টি দেয়, অর্থাৎ বাইরে অবস্থানরত কাফিরদের কেউ যদি নীচে তাকায় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে পাবে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! সেই দুইজন সম্পর্কে আপনার কী অভিমত যাদের সাথে তৃতীয় সত্তা হলেন আল্লাহ্ তা'লা?

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৫৩)

এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র গুণাবলী ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি বিশেষ বিষয় হলো, হিজরতের সফরে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তাঁকে নির্ধারণ করা হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বিপদাপদে তিনি (রা.) তঁার (সা.) সাথে ছিলেন। আর তাঁকে (রা.) প্রারম্ভিক যুগের বিপদাপদের সময় থেকেই মহানবী (সা.)-এর 'আনীস', অর্থাৎ 'বিশেষ বন্ধু' বানানো হয়েছিল যেন খোদার প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে তঁার (রা.) বিশেষ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। আর এতে রহস্য এটি ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা এটি খুব ভালোভাবে জানতেন, সিদ্দীকে আকবর (রা.) সাহাবীদের মাঝে সবচাইতে বেশি সাহসী, খোদাভীরু এবং মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ও বীরপুরুষ ছিলেন। এছাড়া (আল্লাহ্ তা'লা এটাও জানতেন যে,) তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিভোর ছিলেন। তিনি (রা.), অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) প্রাথমিক যুগ থেকেই মহানবী (সা.)-কে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন এবং তঁার (সা.) গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়াদি সামলাতেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা কষ্টদায়ক সময় ও বিপদসঙ্কুল অবস্থায় স্বীয় নবী (সা.)-কে তাঁর (রা.) মাধ্যমে আশ্বস্ত করেন এবং (তাঁকে) 'সিদ্দীক' উপাধি আর উভয় জগতের নবী (সা.)-এর নিকটবর্তীতায় বিশেষত্ব দান করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তঁাকে (রা.) 'সানিয়াসনাইন' (দুজনের মাঝে দ্বিতীয়) হবার গৌরবময় পোশাকে ভূষিত করেন এবং নিজের একান্ত বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৫৯-৬০, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৮-৩৩৯)

অমুসলিম লেখকেরাও হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। আলজেরিয়ার বিংশ শতাব্দির একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন আন্দ্রে সার্ভিয়ের। হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে তিনি লেখেন, আবু বকর সহজ-সরল প্রকৃতির ছিলেন। অভাবনীয় উত্থান সত্ত্বেও তিনি দীনতার সাথে জীবনযাপন করেছেন। মৃত্যুবরণের পর তিনি একটি পুরোনো পোশাক, একজন ক্রীতদাস এবং একটি উট রেখে যান। তিনি আসলে মদীনাবাসীর হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন। তার মাঝে মহান একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আর তা হলো শক্তি ও ক্ষমতা। তিনি লেখেন, মুহাম্মদ (সা.) যে বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছিলেন আর যা তার শত্রুদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য ছিল, সেই গুণ হযরত আবু বকর (রা.)'র মাঝে পাওয়া যেত আর তা ছিল-[অর্থাৎ কী বৈশিষ্ট্য ছিল?] অটল ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস। আর আবু বকর সঠিক স্থানে সঠিক ব্যক্তি ছিলেন। পুনরায় লেখেন, এই বয়োবৃদ্ধ এবং পুণ্যবান ব্যক্তি (তখন) স্বীয় অবস্থানে অটল থাকেন যখন সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজ মু'মিনসুলভ এবং অবিচল সংকল্পের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কার্যক্রমকে নবরূপে আরম্ভ করেন।

(Islam and the Psychology of the Musim by Andre Sevvier page:54)

আরেক বৃটিশ ঐতিহাসিক জে. জে সন্ডার্স লেখেন, প্রথম খলীফার স্মৃতি মুসলমানদের মাঝে সর্বদা এমন এক ব্যক্তি হিসেবে জাগ্রত রয়েছে যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ততা, দয়া ও অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক এবং কোনো তীব্র থেকে তীব্র ঝড়ও তাঁর স্থায়ী সহনশীলতাকে টলাতে পারে নি। তাঁর শাসনকাল যদিও সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু এতে যে সফলতা অর্জিত হয় তা ছিল গৌরবের। তাঁর প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতা ধর্মত্যাগের ধারাকে নিয়ন্ত্রণে এনে আরব জাতিকে পুনরায় ইসলামের গণ্ডিভুক্ত করে এবং তাঁর সিরিয়া অবরোধের দৃঢ় সংকল্প আরব বিশ্বের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করে।

(London 2002 45-A History of Medieval Islam by Sanders page44)

অতঃপর আরেকজন ইংরেজ লেখক এইচ. জি ওয়েলস বলেন, 'এটি বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত রচনায় আবু বকরের ভূমিকা মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে বেশি ছিল, যিনি তাঁর (সা.) বন্ধু এবং সাহায্যকারী ছিলেন।' যদিও তিনি এখানে অতিরঞ্জকতার আশ্রয় নিয়েছেন। যাইহোক, এরপর তিনি লেখেন, 'মুহাম্মদ (সা.) যদি তাঁর দোদুল্যমান ভূমিকা সত্ত্বেও প্রাথমিক ইসলামের মস্তিষ্ক এবং রূপকার হয়ে থাকেন, (নাউযুবিল্লাহ্) তাহলে আবু বকর ছিলেন এর (অর্থাৎ ইসলামের) প্রজ্ঞা এবং দৃঢ়তা। যখনই মুহাম্মদ (সা.) দোদুল্যমান হতেন তখন আবু বকর তাঁর অবলম্বন হয়ে যেতেন।' যাহোক, এসব কথা তার অনর্থক এবং বেহুদা কথাবার্তা যাতে কোনো সত্যতা নেই, কিন্তু পরবতীতে তিনি যে সঠিক কথাগুলো লিখেছেন তা হলো, 'মুহাম্মদ (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন আবু বকর তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হন এবং অবিচল ঈমান নিয়ে তিনি অত্যন্ত সরলতা এবং বিচক্ষণতার সাথে তিন অথবা চার হাজার আরব সংবলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে আল্লাহ্র নির্দেশ পালনকারী বানানোর কাজ আরম্ভ করেন।'

(A Short History of the World by H.G Wells page: 76)

যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, লেখক হযরত আবু বকরের কতিপয় গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন যা নিঃসন্দেহে তঁার মাঝে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু যেহেতু তারা মহানবী (সা.)-এর সেই সুউচ্চ এবং সুমহান নবুয়্যতের মর্যাদার প্রকৃত জ্ঞান ও ধারণা রাখত না তাই হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর প্রমুখের প্রশংসায় এতটা অতিশয়োক্তি করে থাকে যা কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। যদিও হযরত উমর হোন বা হযরত আবু বকর, তাঁরা সবাই তঁাদের মনিব ও মহান অনুসরণীয় সত্তা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিশ্বস্ত এবং পূর্ণ আনুগত্যকারী ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি ছিলেন না, বরং সেবকরূপে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য হাত ও পা (স্বরূপ) ছিলেন। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্ম মুহাম্মদ (সা.)-এর মস্তিষ্কের নাম বা কর্ম ছিল না, যেমনটি তিনি লিখেছেন যে, ইসলাম ধর্মের মস্তিষ্ক হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্, বরং সম্পূর্ণঐশী নির্দেশনা এবং আল্লাহ্র ওহীর ফলশ্রুতিতে একটি পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গীন শরীয়ত ও ধর্মের নাম ইসলাম। এছাড়া কোনো ধরণের ভীতি বা দোদুল্যমানতার সময় হযরত আবু বকর মহানবী (সা.)-এর অবলম্বন হন নি। বরং প্রথমত মানবের মাঝে সবচেয়ে নিভীক,দুঃসাহসী ও বীর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমগ্র জীবনে আমরা কখনো কোনো উৎকণ্ঠা অথবা দোদুল্যমানতা দেখতে পাই না। আর কোনো উৎকণ্ঠা বা আশঙ্কার মুহূর্ত এলেই সর্বশক্তিমান এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী (আল্লাহ্) তাঁর জন্য পৃষ্ঠপোষক হয়ে যেতেন। লেখক লিখেছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে সাহস যোগাতেন, অথচ আমরা একেবারে এর বিপরীত (চিত্র) দেখেছি। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবনে কোনো উৎকণ্ঠা কিংবা বিচলিত অবস্থা দেখা দিলেও মহানবী (সা.) তাঁকে সাহস যোগাতেন। যেমনটি হিজরতের সময় হযরত আবু বকর (রা.) চরম উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও এই উৎকণ্ঠা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় তাঁর জন্যই ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র এহেন উৎকণ্ঠার সময়ে মহানবী (সা.) তাঁকে সাহস যোগান। তিনি (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا । অর্থাৎ হে আবু বকর! তুমি বিচলিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। আর যেমনটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম আর মহানবী (সা.) আমাকে প্রবোধ দিয়েছেন। অতএব এই একটি ঘটনাই তাঁর (সা.) খোদা-নির্ভরতা এবং আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যাহোক, এসব নির্বোধেরা যখন কোনো সত্য স্বীকারে বাধ্য হয় তখন তারা এর মাঝে কিছু না কিছু নোংরামি মিশ্রণের চেষ্টাও অবশ্যই করে।

এরপর যুক্তরাজ্যের আরেকজন প্রাচ্যবিদ টি. ডব্লিউ আরনল্ড বলেন, আবু বকর একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন, তার উত্তম নৈতিকতা, মেধা এবং যোগ্যতার কারণে তার স্বজাতি তাকে খুবই সম্মান করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার ধনসম্পদের অনেক বড় অংশ সেসব মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করার কাজে ব্যয় করেন যাদেরকে কাফিররা তাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষায় ঈমান আনার কারণে দুঃখকষ্ট দিতো।

(The Preaching of Islam by T.W Arnold page:10 Archibd constable & co.)

এরপর স্কটল্যান্ডের একজন প্রাচ্যবিদ এবং ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যুর। তিনি লেখেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকাল সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর পর ইসলাম আবু বকর (রা.)'র চেয়ে আর কারো প্রতি এত বেশি কৃতজ্ঞ নয়। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.)'র চেয়ে বেশি ইসলামের সেবা আর কেউ করে নি।

হযরত আবু বকর (রা.)'র অনুপম নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি কি সত্য নয় যে, বড় বড় শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ্‌রা আবু বকর এবং উমর, বরং হযরত আবু হুরায়রার নাম উচ্চারণের পর অবলীলায় রাযিআল্লাহু আনহু বলে উঠতো আর এই আকাঙ্ক্ষা করতো যে, 'আমরা যদি তাদের সেবা করারই সুযোগ পেতাম! কাজেই কে এমন আছে যে বলতে পারে, আবু বকর, উমর এবং আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'লা আনহুম দরিদ্র জীবনযাপন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? যদিও তারা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের জন্য এক মৃত্যু স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু সেই মৃত্যুই তাদের জীবন সাব্যস্ত হয়েছে এবং কোনো শক্তিই এখন আর তাদেরকে মারতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন।"

(শুকরিয়া অউর এলান জরুরী, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড,পৃ: ৭৪)

তিনি (রা.) আরো বলেন, আবু বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা কেবল এ কারণে আবু বকর বানান নি যে, তিনি কাকতালীয়ভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উমর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এজন্য উমরের মর্যাদা দান করেন নি যে, তিনি ঘটনাচক্রে মহানবী (সা.)-এর যুগে জন্ম নিয়েছিলেন। উসমান এবং আলী (রা.)-কে শুধুমাত্র এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা উসমান ও আলীর সম্মানে ভূষিত করেন নি যে, তারা ঘটনাক্রমে মহানবী (সা.)-এর জামাতা হওয়ার মর্যাদায় লাভ করেছিলেন কিংবা তালহা এবং যুবায়েরকে কেবল এ কারণে সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রদান করা হয় নি যে, তারা মহানবী (সা.)-এর বংশধর বা তাঁর স্বজাতির মানুষ ছিলেন আর তাঁর (সা.) যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বরং তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যারা তাদের কুরবানীর মান এমন উচ্চ স্তরে উপনীত করেছিলেন যার চেয়ে উচ্চ স্তরে যাওয়া মানুষের কল্পনাতেও আসে না।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৬, পৃ: ৩৮৪-৩৮৫)

অতএব এসব কুরবানীই হলো এমন জিনিস যা মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, আমাদের হৃদয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র কতই না সম্মান রয়েছে! কিন্তু কেউ কি বলতে পারে যে, এই সম্মান তাঁর সন্তানদের কারণে সৃষ্টি হয়েছে? আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যারা জানেও না যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশধারা কতদূর পর্যন্ত চলেছে; কেননা তাঁর বংশধারার তালিকাই সংরক্ষিত নেই। বর্তমানে এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশধর হিসেবে পরিচয় দিয়ে নিজেকে সিদ্দিকী দাবি করে। কিন্তু কেউ যদি তাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা শপথ করে বলো যে, সত্যিকার অর্থেই তুমি সিদ্দিকী আর তোমার বংশধারা (পর্যায়ক্রমে) হযরত আবু বকর (রা.) পর্য ন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে তারা কখনোই কসম খেতে পারবে না; আর তারা যদি কসম খায়ও তবে আমরা বলব, তারা মিথ্যা বলছে আর তারা বেঈমান। এর কারণ হলো, হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশধারার হিসাব এতটা সুরক্ষিতই নেই যে, বর্তমানে কেউ নিজেকে সঠিকভাবে তাঁর প্রতি আরোপ করতে পারে। অতএব আমরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সম্মান এজন্য করি না যে, তাঁর বংশধরদের কর্ম কাণ্ড অতি উচ্চ মানের। আমরা হযরত উমর (রা.)-কে সম্মান এজন্য করি না যে, তাঁর বংশধরদের কার্যক্রম খুবই উচ্চ মানের। আমরা হযরত উসমান (রা.)-কে সম্মান এজন্য করি না যে, তাঁর বংশধররা কোনো উল্লেখযোগ্য কর্ম কাণ্ড করছে। এছাড়া আমরা হযরত আলী (রা.)-কে এজন্য স্মরণ করি না যে, তাঁর বংশধরদের মাঝে বিশেষ গুণাবলী রয়েছে। হযরত আলী (রা)-এর বংশধারা এখনো পর্যন্ত চলমান রয়েছে কিন্তু তাঁকে এজন্য সম্মান করা হয় না যে, তাঁর বংশধর এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্যান্য যত সাহাবী ছিলেন তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনও এমন নেই যাকে তার পরবর্তী প্রজন্মের কারণে স্মরণ করা হয়। অতএব প্রকৃত বিষয় হলো, আমরা তাদেরকে তাদের ব্যক্তিগত কুরবানী বা আত্মত্যাগের জন্য স্মরণ করি এবং তাঁদেরকে সম্মান করি।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৭, পৃ: ৬৫৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো বলেন, "হযরত আবু বকর (রা.)-কেই দেখ! তিনি (রা.) মক্কার একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি আবির্ভূত না হতেন আর মক্কার ইতিহাস লেখা হতো তবে ইতিহাসবিদ কেবল এতটুকু উল্লেখ করত যে, আবু বকর আরবের একজন অভিজাত ও সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে আবু বকর (রা.) সেই মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন যে, আজ গোটা বিশ্ব সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর মুসলমানরা যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজেদের খলীফা ও বাদশাহ্ মনোনীত করে তখন এই সংবাদ মক্কাতেও পৌঁছে। (সেখানে) একটি বৈঠকে অনেক মানুষ বসে ছিল, যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন শোনেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে লোকেরা বয়আত করেছে তখন এ বিষয়টি তার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে তিনি সংবাদদাতাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন্ আবু বকরের কথা বলছ? সে বলে, সেই আবু বকর যিনি আপনার পুত্র। হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফা আরবের এক একটি গোত্রের নাম ধরে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেন, তারাও কি আবু বকরের (হাতে) বয়আত গ্রহণ করেছে? এরপর বড় বড় গোত্রগুলোর নাম ধরে জিজ্ঞেস করেন, তারাও কি আবু বকরের বয়আত গ্রহণ করেছে? সে যখন বলে যে, সবাই একমত হয়ে আবু বকর (রা.)-কে খলীফা ও বাদশাহ্ বানিয়েছে তখন আবু কোহাফা অবলীলায় বলে ওঠেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি (আরো) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সত্য রসূল। তিনি (রা.) বলেন, অথচ তিনি অনেক আগে থেকেই মুসলমান ছিলেন। আবু কোহাকা মক্কা বিজয়ের পরে অথবা হয়ত এর পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি যে এই কালেমা পাঠ করেছেন এবং পুনরায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালতের (সত্যতার) ঘোষণা দিয়েছেন সেটির কারণ হলো, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর তার চোখ খুলে যায় আর তিনি বুঝতে পারেন যে, এটি ইসলামের সত্যতার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ; অন্যথায় আমার সন্তানের এমন কী যোগ্যতা ছিল যে, তার হাতে সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে?"

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০৫-২০৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে লেখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখুন! তিনি (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন লোকেরা বলতে আরম্ভ করে, (তিনি) মক্কার একজন নেতা ছিলেন, কিন্তু এখন লাঞ্ছিত হয়ে গেলেন। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরচেয়ে বেশি তাঁর আর কী সম্মান হতে পারত যে, দুইশ' বা তিনশ' মানুষ সম্মানের সাথে তাঁর নাম নিত, কিন্তু ইসলামের কল্যাণ (এত বেশি) যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে খিলাফত ও রাজত্বের কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাঁকে এক স্থায়ী সম্মান ও অফুরন্ত খ্যাতির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। কোথায় একটি গোত্রের নেতৃত্ব আর কোথায় সমগ্র মুসলিম জগতের খলীফা এবং আরব দেশগুলোর রাজা হওয়া, যিনি ইরান ও রোমকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরাস্ত করেছেন!"

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৭)

অন্যত্র তিনি (রা.) বলেন, দেখুন! রাজত্ব কেবল মহানবী (সা.)-এরই পদচুম্বন করে নি বরং তাঁর সেবকদেরও পদচুম্বন করেছে। কিন্তু তিনি (সা.) তখনো (রাজত্বের) বাসনা করেন নি যখন তিনি (সা.) রাজত্ব পান নি, আর তখনো (রাজত্বের) বাসনা করে নি যখন তিনি (সা.) রাজত্ব পেয়ে গেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.) রাজত্বের বাসনা করেন নি, হযরত উমর (রা.) রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা করেন নি, হযরত উসমান (রা.)-ও রাজত্বের জন্য লালায়িত ছিলেন না আর হযরত আলী (রা.)-ও রাজত্ব লাভের কামনা করতেন না, বরং তাঁদের মাঝে রাজত্বের কোনো লক্ষণই পাওয়া যেত না। অথচ পৃথিবীতে তাঁরা এমন প্রতাপের অধিকারী রাজা-বাদশাহ্ ছিলেন যার কোনো দৃষ্টান্তই ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের প্রকৃতি এমন অনাড়ম্বরপূর্ণ ছিল, তাদের সাথে সাক্ষাত করা এত সহজ ছিল এবং তঁাদের মধ্যে এত বেশি বিনয় পরিলক্ষিত হত যে, বাহ্যত বুঝার কোনো উপায়ই ছিল না যে, তাঁরা রাজা। তাঁদের কেউই বলেন নি, এটি আমার রাজত্ব আর আমি রাজা। তাঁদের কেউই কখনো নিজেদের রাজা হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং তাঁরা এর বাসনাও করেন নি। বস্তুত যারা খোদার জন্য নিবেদিত হয়ে যান, জগৎ নিজে তাদের পদচুম্বন করে। মানুষ মনে করে, রাজা হওয়ার ফলে তারা সাহায্য পাবে; কিন্তু যারা খোদার জন্য নিবেদিত হয়ে থাকেন রাজ্য মনে করে যে, তাদের সেবা করলে ধন্য হবে। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ৯৯)

তিনি (রা.) আরেক স্থানে বলেন, দেখুন! আবু বকর (রা.) রাজা হয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর পিতা মনে করত তাঁর রাজা হওয়া অসম্ভব। কেননা তিনি (রা.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে রাজত্ব লাভ করেছিলেন। এর বিপরীতে তৈমুরও একজন বড় রাজা ছিল। সে তার জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার দরুন রাজা হয়েছিল;

নেপোলিয়ানও অনেক বড় রাজা ছিল, কিন্তু সে তার পরিশ্রম ও জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজা হয়েছিল; নাদের শাহ্ও অনেক বড় রাজা ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তিগত পরিশ্রম, সাধনা এবং জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে তা পেয়েছিল। অতএব রাজত্ব বা সাম্রাজ্য সবাই পেয়েছে। কিন্তু আমি বলব, তৈমুর মানুষের সাহায্যে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু আবু বকর (রা.) রাজত্ব পেয়েছেন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে। আমি বলব, নেপোলিয়ন জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টায় রাজত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে রাজত্ব পেয়েছেন। আমি বলব, চেঙ্গিস খান জাগতিক উপায় উপকরণের মাধ্যমে রাজত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-কে রাজত্ব দিয়েছেন খোদা তা'লা। আমি বলব, নাদের শাহ্ জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার জোরে রাজত্ব পেয়েছিল ,অথচ হযরত আলী (রা.)-কে খোদা তা'লা রাজত্ব দিয়েছেন।

মোটকথা, রাজত্ব সবাই পেয়েছেন। জাগতিক রাজা-বাদশাহ্রও প্রভাব, প্র তাপ ছিল আর তাদের আইনও প্রয়োগ হতো আর খলীফাদেরও (এসব ছিল)। বরং তাদের আইন প্রয়োগ হতো হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)'র চেয়ে বেশি, কিন্তু এঁরা, অর্থাৎ এই চারজন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাজা মনোনীত হয়েছিলেন আর জাগতিক রাজা-বাদশাহ্রা মানুষের মাধ্যমে রাজত্ব লাভ করেছিল। অতএব মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সাধারণ কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে না সে কিছু পায় না; [তিনি (রা.) এখানে বিসমিল্লাহ্ পাঠের কল্যাণ বর্ণনা করছেন।] এ কথার অর্থ এই নয় যে, সে তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, বরং এর অর্থ হলো তার এ লক্ষ্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অর্জি ত হওয়া সম্ভব না। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যে রাজত্ব লাভ করার কথা ছিল তা হযরত আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রা.) লাভ করেছেন; তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ তা পায় নি। অন্যরা যে রাজত্ব পেয়েছে তা শয়তানের কাছ থেকে পেয়েছে অথবা তা মানুষের কাছ থেকে লাভ করা। অন্যথায় লেনিন, স্টালিন, মালেনকভ বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে নি , কিন্তু তারা রাজত্ব লাভ করেছে। রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ারও বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে নি, অথচ তারাও রাজত্ব লাভ করেছে। তারা তো বিসমিল্লাহ্ সম্পর্কে জানতই না আর বিসমিল্লাহ্র কোনো মর্যাদাও তাদের হৃদয়ে নেই। অতএব মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা ছাড়া কল্যাণ লাভ করা যায় না তখন এর উদ্দেশ্য ছিল, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কিছুই লাভ করা যায় না। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কেবল সে ব্যক্তিই কল্যাণমণ্ডিত হয় যে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পড়ে নেয়। এখন সবাই এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জিনিস অধিক কল্যাণমণ্ডিত হয় না কি বান্দাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জিনিস অধিক বরকতময় হয়। মানবীয় প্রচেষ্টায় অর্জিত রাজত্বের অবসানও ঘটতে পারে, কিন্তু খোদা তা'লা প্রদত্ত রাজত্বের অবসান ঘটতে পারে না।

হায়! আজ মুসলমানরাও যদি এ বিষয়টি বুঝতে পারত! যদিও তারা বিসমিল্লাহ্ পড়ে তবে মনে হয় যেন তা কেবল বুলিসর্বস্ব, অন্ত র থেকে উৎসারিত নয়।

পুনরায় তিনি (রা.) লেখেন, ইয়াযিদও একজন রাজা ছিল, তার কতই না দম্ভ ছিল আর তার ক্ষমতার কতই না দাপট ছিল! সে মহানবী (সা.)-এর বংশ ধ্বংস করেছে। অথচ বাহ্যত সে নিজেকে মুসলমান হিসেবেই দাবি করত। সে তাঁর (সা.) বংশধরদের হত্যা করেছে, কিন্তু তার অনুতাপ ছিল না, বরং সে আরো দম্ভ করত। সে মনে করত, আমার সামনে কথা বলার মত ক্ষমতা কারো নেই। হযরত আবু বকর (রা.)ও দেশের রাজা হন,কিন্তু তাঁর মাঝে নম্রতা ও বিনয় ছিল। তিনি (রা.) বলতেন, খোদা তা'লা আমাকে মানবসেবার উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন আর সেবার জন্য যতটুকু সুযোগই আমি লাভ করি তা তাঁর অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে ইয়াযিদ বলত, আমি আমার পিতার কাছ থেকে রাজত্ব পেয়েছি,তাই আমি যাকে ইচ্ছে জীবিত রাখব, যাকে ইচ্ছে মেরে ফেলব। বাহ্যত ইয়াযিদ তার সাম্রাজ্যের দিক থেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র (সাম্রাজ্যের) চেয়ে বড় ছিল। সে বলত, আমি বংশপরম্পরায় রাজা। আমার সামনে কথা বলার মত স্পর্ধা কার আছে? অথচ হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, রাজা হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার কোথায় ছিল? আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা খোদা তা'লাই দিয়েছেন। আমি নিজ ক্ষমতাবলে রাজ হতে পারব না। আমি সবারই সেবক। আমি দরিদ্রেরও সেবক আর ধনীদেরও সেবক। আমার পক্ষ থেকে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে এখনই আমার কাছ থেকে সেটির প্রতিশোধ নিয়ে নাও। কিয়ামতের দিন আমাকে হেয় করো না। হযরত আবু বকর (রা.)'র একথা শুনলে কেউ হয়তো বলবে, এ কী! তাঁর তো একজন গ্রাম্য মাতব্বরের ন্যায় আধিপত্যও নেই। কিন্তু সে ইয়াযিদের কথা শুনে থাকলে বলবে, এগুলো হচ্ছে রোমান ও পারস্য সম্রাটের ন্যায় কথাবার্তা যা ইয়াযিদ বলছে। অথচ হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুবরণের পর তাঁর পুত্র, তাঁর পৌত্র, তাঁর প্রপৌত্র এবং প্রপৌত্রদের পুত্ররা এবং আরো অগ্রসর হয়ে সেই বংশধর যাদের মাঝে পৌত্র বা প্রপৌত্রের প্রশ্নই ওঠে না- তারাও সর্বদা আবু বকর (রা.)'র বংশধর বলে গর্ব করতো। তাদের কথা বাদ দাও, যারা হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে সম্বন্ধের দাবিদারও নয়, যারা তাঁর (রা.) বংশধরের সাথেও কখনো সাক্ষাৎ করে নি- তারাও যখন আজ তাঁর (রা.) ঘটনাবলী পাঠ করে (তখন) তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে, তাদের ভালোবাসা উদ্বেলিত হয়। কোনো ব্যক্তি তাঁকে মন্দ বললে তাদের রক্ত টগবগ করতে থাকে। মোটকথানিজ সন্তানসন্ততিরা তো বটেই, অন্যরাও তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তু ত হয়ে যায়। প্রত্যেক কলেমা পাঠকারী যখন তাঁর নাম শোনে তখন (অবলীলায়) বলে ওঠে 'রাযিয়াল্লাহুআনহু'। কিন্তু সেই দাম্ভিক ইয়াযিদ, যে নিজেকে বাদশাহ্র পুত্র বাদশাহ্ বলে বলে ক্লান্ত হতো না, সে মৃত্যুবরণ করলে লোকেরা তার পুত্রকে তার স্থলে বাদশাহ্ বানিয়ে দেয়। জুমু'আর দিন এলে তিনি মিম্বরে ওঠেন আর বলেন, হে লোকসকল! আমার দাদা যখন বাদশাহ্ হন তখন বাদশাহ্ হবার মতো তাঁর চেয়েও বেশি যোগ্য লোক বিদ্যমান ছিলেন। আমার পিতা যখন বাদশাহ্ হন তখনো তার চেয়ে অধিক যোগ্য লোক বিদ্যমান ছিলেন। এখন আমাকেও বাদশাহ্ বানিয়ে দেয়া হয়েছে অথচ আমার চেয়ে অধিক যোগ্য লোক (এখনো) রয়েছেন। হে লোকসকল! আমার দ্বারা এই বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। আমার পিতা এবং আমার দাদাএ পদের অধিক) যোগ্যদের অধিকার হরণ করেছে। কিন্তু আমি তাদের অধিকার হরণ করতে প্রস্তুত নই। তোমাদের খিলাফত এই রইল, যাকে ইচ্ছা দিয়ে দাও। আমি নিজেও এর যোগ্য নই এবং আমার বাপ-দাদাকেও এর জন্য যোগ্য মনে করি না। তারা জোরপূর্বক এবং অন্যায়ভাবে রাজত্ব দখল করেছিল, আমি এর হকদার লোকদেরকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই। একথা বলে তিনি নিজ ঘরে চলে যান। এই ঘটনা শুনেন তাঁর মা বলেন, হে হতভাগা! তুই তোর বাপ-দাদার নাক কেটে এলি? তিনি উত্তরে বলেন, হে আমার মা! আল্লাহ্ যদি তোমাকে বুদ্ধিমত্তা দিতেন তাহলে তুমি বুঝতে পারতে, আমি আমার বাপ-দাদার সুনামহানি করি নি, বরং আমি তাদেরকে লাঞ্ছনার স্থল থেকে তুলে এনে সম্মানের আসনে বসিয়েছি। (অর্থাৎ সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছি)। এরপর তিনি নিজ ঘরে নির্জনে বসে যান এবং আমৃত্যু ঘর থেকে বের হন নি।"(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৪, পৃ: ৮৬-৮৮)

অতএব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে রাজত্ব লাভ হয় সেটির দাবিও পূরণ করা হয়। আমাদের মুসলিম নেতা এবং রাজা-বাদশাহ্দের জন্যও এতে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলাম এবং ধর্মের জন্য বিভিন্ন ধরনের কুরবানী করার কারণে আজ হযরত আবু বকর (রা.)'র যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে তা কি জগতের বড় বড় রাজা-বাদশাহ্ও অর্জন করতে পেরেছে? আজ পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ্দের মাঝে এমন একজনও নেই যে এতটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে যতটা লাভ করেছেন হযরত আবু বকর (রা.)। বরং হযরত আবু বকর (রা.)'র কথা বাদই দিলাম, কোনো বড় থেকে বড় বাদশাহ্রও ততটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় নি যতটা (শ্রেষ্ঠত্ব ) মুসলমানদের কাছে হযরত আবু বকর (রা.)'র সেবকরা লাভ করেছে। বরং প্রকৃত সত্য হলো, আমাদের কাছে তো হযরত আবু বকর (রা.)'র কুকুরও অনেক সম্মানী ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রিয়। কারণ তিনি (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গৃহের সেবক হয়ে গিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গৃহের সেবক হয়ে গিয়েছেন তঁ ার প্রত্যেকটি জিনিসই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে গিয়েছে। এখন এটি সম্ভবই নয় যে, কেউ আমাদের হৃদয় থেকে এই শ্রেষ্ঠত্ব মিটিয়ে দিতে পারে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ৬৮১)

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, নাউযুবিল্লাহ্ আমরা মহানবী (সা.)-এর অসম্মান করি; অথচ এই হলো আমাদের চিন্তাচেতনা।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র এক পুত্র, যিনি বেশ পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; একবার তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে বসে ছিলেন এবং বিভিন্ন কথাবার্তা হচ্ছিল; কথায় কথায় তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা! অমুক যুদ্ধের সময় আমি একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে ছিলাম। আপনি দু'বার আমার সামনে দিয়ে গিয়েছেন। আমি চাইলে তখন আপনাকে হত্যা করতে পারতাম; কিন্তু আমি একথা ভেবে হাত তুলি নি যে, আপনি আমার পিতা। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনে বলেন, আমি তখন তোমাকে দেখতে পাই নি। আমি যদি তোমাকে দেখতে পেতাম তবে অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম, কারণ তুমি আল্লাহ্র শত্রু হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলে।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৬, পৃ: ৬২১-৬২২)

হযরত আবু বকর (রা.)'র উন্নত চরিত্র সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আবু বকর (রা.) ছিলেন সেই ব্যক্তি যাঁর প্রকৃতিতে সৌভাগ্যের তেল ও প্রদীপ আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। [অর্থাৎ তাঁর মাঝে জ্বলে ওঠার ও আলোকিত হওয়ার যোগ্যতা ছিল।] তাই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে কোনো তর্ক করেন নি, কোনো নিদর্শন বা মু'জিযা দেখতে চান নি; দাবির কথা শোনার পর শুধু এটুকুই জানতে চেয়েছেন যে, আপনি কি নবুয়্যতের দাবি করছেন? রসূলুল্লাহ্ (সা.) 'হ্যাঁ' বলার সাথে সাথেই তিনি (রা.) বলে ওঠেন, আপনি সাক্ষী

থাকুন, আমি সবার আগে ঈমান আনছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যারা প্রশ্ন উত্থাপন করে তারা খুব কমই হেদায়েত লাভ করে। হ্যাঁ, সুধারণা পোষণকারী ও ধৈর্য ধারণকারীরা পূর্ণরূপে হেদায়েত লাভ করে থাকে। এর উদাহরণ আবু বকর ও আবু জাহল দুজনের মাঝেই রয়েছে। আবু বকর কোনো বিতর্ক করেন নি এবং নিদর্শন দাবি করেন নি, কিন্তু তিনি তা পেয়েছেন যা নিদর্শনপ্রার্থীরা পায় নি। তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখেছেন আর নিজেই এক মহান নিদর্শনে পরিণত হয়েছেন। (পক্ষান্তরে) আবু জাহল তর্ক করেছে এবং বিরোধিতা ও মূর্খতা অবলম্বন করা থেকে বিরত হয় নি। সে নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও (সত্য) দেখার সামর্থ্য তার হয় নি। শেষমেশ নিজেই অন্যদের জন্য নিদর্শনে পরিণত হয়ে বিরোধিতার মাঝেই ধ্বংস হয়েছে।"

( মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, মক্কার সেই একই মাটি ছিল যেখান থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এবং আবু জাহলের জন্ম। এটি সেই মক্কাই যেখানে আজ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে সকল শ্রেণি ও স্তরের কোটি কোটি মানুষ একত্রিত হয়। এই দেশেই এদুজন মানুষের জন্ম, যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজের সৌভাগ্য ও ধীশক্তির জন্য হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে সিদ্দীকদের উৎকর্ষ লাভ করেছেন, আর অপরজন দুষ্কৃতি, নিরেট অজ্ঞতা, শত্রুতা ও সত্যের বিরোধিতার কারণে কুখ্যাত। স্মরণ রেখো, উৎকর্ষ দুই প্রকারেরই হয়ে থাকে, একটি হলো রহমান খোদার পক্ষ থেকে এবং অপরটি শয়তানের পক্ষ থেকে। রহমান খোদার পক্ষ থেকে উৎকর্ষ লাভকারী ব্যক্তি উর্ধ্বলোকে এক সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন। অনুরূপভাবে শয়তানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উৎকর্ষে র অধিকারী ব্যক্তি শয়তানের বংশধরদের মাঝে সুখ্যাতি রাখে। মোটকথা, দুজন একই স্থানে ছিলেন। আল্লাহ্র নবী (সা.) কারো মাঝে কোনো পার্থক্য করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা যে নির্দে শই দিয়েছেন সেগুলোর সবই সমানভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু হতভাগা ও দুর্ভাগারা বঞ্চিত থেকেছে এবং সৌভাগ্যবানরা হেদায়েত লাভ করে উৎকর্ষের অধিকারী হয়েছেন। আবু জাহল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা অসংখ্য নিদর্শন দেখেছে, ঐশী জ্যোতি ও কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু তাদের কোনোই লাভ হয় নি।" ( মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৪)

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, দেখ! পবিত্র মক্কা নগরীতে যখন মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটে তখন আবু জাহলও মক্কাতেই ছিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-ও মক্কারই বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু আবু বকরের প্রকৃতিতে সত্য গ্রহণের সাথে এমন সম্বন্ধ ছিল যে, তখনো তিনি শহরে প্রবেশ করেন নি; (এমতাবস্থায়) পথিমধ্যেই যখন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, নতুন কোনো খবর শোনাও। উত্তর সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) নবুয়্যতের দাবি করেছেন। একথা শুনে তিনি সেখানেই ঈমান আনয়ন করেন এবং কোনো ধরনের মু'জেযা বা নিদর্শ ন তলব করেন নি; যদিও পরবর্তীতে তিনি অগণিত অলৌকিক নিদর্শন দেখেছেন এবং নিজেও এক নিদর্শন আখ্যায়িত হয়েছেন। কিন্তু আবু জাহল হাজার হাজার নিদর্শন দেখেছে, তা সত্ত্বেও সে বিরোধিতা ও অস্বীকার করা থেকে বিরত হয় নি আর মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যানই করতে থাকে।

এতে কী রহস্য বা নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল? দুজনের জন্মস্থান একটিই ছিল। একজন সিদ্দীক আখ্যায়িত হন আর অপরজন যাকে আবুল হাকাম বলা হতো সে আবু জাহল আখ্যায়িত হয়। এতে এ রহস্যই অন্তর্নিহিত ছিল যে, সত্যের সাথে তার প্রকৃতির লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না। আসলে ঈমানী বিষয়াবলী পারস্পরিক সামঞ্জস্যতার ওপর নির্ভর করে। যখন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন তা নিজেই শিক্ষকে পরিণত হয় এবং সত্য ও সঠিক বিষয়ে শিক্ষা দান করে, আর একারণেই সামঞ্জস্য অর্জনকারী সত্তাও একটি নিদর্শন হয়ে থাকে। "

( মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১-১২)

আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্র ভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, সিদ্দীক, ফারুক এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম পুণ্যবান ও মু'মিন ছিলেন , আর সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ বেছে নিয়েছেন এবং রহমান খোদার আশিস ও কৃপায় যারা মনোনীত হয়েছেন, আর অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীরা তাদের গুণাবলীর সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য স্বদেশ ছেড়েছেন, প্রতিটি যুদ্ধের কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন এবং গ্রীষ্মের দুপুরের দাবদাহ এবং শীতের রাতের চরম শীতের পরোয়া করেন নি, বরং উঠতি যুবকের ন্যায় ধর্মের পথে আত্মবিলিন হয়ে পরিচালিত হয়েছেন, আর আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হন নি এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের খাতিরে সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাদের কাজকর্মে সৌরভ এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সুবাস রয়েছে।আর এই সবকিছু তাদের উন্নত পদমর্যাদার বাগান ও তাদের পুণ্যসমূহের ফুলবাগিচার প্রতি নির্দেশ করে আর এর মৃদুমন্দ বাতাস আপন সুরভিত দমকা হাওয়ার মাধ্যমে এর গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে অবগত করে এবং তাদের জ্যোতি পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যের সাথে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।" (সিররুল খোলাফা, পৃ: ২৫-২৬)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ তা'লা শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর ও উমরকে এবং তৃতীয়জন যিনি যুননূরাইন তথা হযরত উসমান- এদের সবাইকে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রসেনা বানিয়েছেন। সুতরাং যে তঁাদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন না করে, বরং তাঁদেরকে অবমাননা ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাদের বিষয়ে কটুক্তি দ্বারা আক্রমণ করে- আমি এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা করি। যারা তাঁদের কষ্ট দিয়েছে, অভিসম্পাত করেছে ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, পরিণামে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আর তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়েছে। এটি আমার অনেকবারের অভিজ্ঞতা এবং আমি একথা স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা সকল কল্যাণের উৎস আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। যে-ই তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না। (সিররুল খোলাফা, পৃ: ২৮-২৯)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, তোমরা কীভাবে এমন ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করতে পার যাঁর দাবিকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রমাণ করেছেন? [কোনো কোনো ফির্কা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করে;] তিনি (আ.) বলেন, তোমরা কীভাবে এমন ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করতে পার যাঁর দাবিকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রমাণ করেছেন? আর তিনি যখন আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়েছেন তখন আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সমর্থনে নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছেন আর ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন? তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামকে এমন সব বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন যা সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে,আর এমন অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বিষাক্ত সাপকে হত্যা করেছেন, তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে সকল মিথ্যাবাদীকে পরাস্ত ও অকৃতকার্য করেছেন। এছাড়াও হযরত সিদ্দীকের আরো অনেক গুণ ও অবদান রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। চরম সীমালংঘনকারী ছাড়া অন্য কেউই একথা অস্বীকার করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মু'মিনদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী এবং কাফির ও মুরতাদ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আগুনের নির্বাপক বানিয়েছেন এবং এরই পাশাপাশি তিনি তঁাকে কুরআনের প্রথম সুরক্ষাকারী, কুরআনের সেবক ও আল্লাহ্র কিতাব 'কিতাবুল মুবীন'-এর প্রচারক বানিয়েছেন। অনুরূপভাবে কুরআন সংকলন ও দয়াময় খোদার প্রিয় রসূল (সা.)-এর কাছ থেকে এর ক্রমবিন্যাসের জ্ঞান লাভের জন্য তিনি নিজের সব চেষ্টা নিয়োজিত করেছেন। এছাড়া ধর্মের শুভাকাঙ্ক্ষায় তাঁর দুনয়ন বহমান ঝর্নার চেয়েও অধিক অশ্রুবর্ষণ করেছে।" (সিররুল খোলাফা, পৃ: ৫৭-৫৮)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অদ্ভুত বিষয় হলো, শিয়ারাও স্বীকার করে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এমন সময়ে ঈমান এনেছিলেন যখন শত্রুর সংখ্যা ছিল অগণিত। তিনি চরম পরীক্ষার যুগে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা থেকে বের হয়েছেন তাঁর সাথে হযরত আবু বকরও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে হুযূর (সা.)-এর সাহায্যকারী হিসেবে বের হয়েছেন। সব দুঃখকষ্ট তিনি সহ্য করেছেন আর প্রিয় স্ব দেশ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পরিত্যাগ করেছেন এবং সব আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দিয়ে স্নেহশীল প্রভুকে বেছে নিয়েছেন। এছাড়া সব যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং মনোনীত নবী (সা.)-কে সাহায্য করেছেন। এমন সময় তিনি খলীফা মনোনীত হন যখন মুনাফিকদের একটি বড় দল মুরতাদ হয়ে যায় এবং অনেক মিথ্যাবাদী নবুয়্যতের দাবি করে। ফলে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং সন্ত্রাসীরা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং লড়াই অব্যাহত রেখেছেন।

এরপর তিনি ইহধাম ত্যাগ করার পর নবীকুল শিরোমণি ও নিষ্পাপদের ইমাম মুহাম্মদ (সা.)-এর কবরের পাশে সমাহিত হন। জীবদ্দশায়ও বা মৃত্যুর পরও তিনি আল্লাহ্র বন্ধু এবং তাঁর রসূল (সা.) থেকে পৃথক হন নি, বরং অল্প কিছু দিনের বিচ্ছেদের পর আবার উভয়ে মিলিত হয়েছেন এবং ভালোবাসার উপহার উপস্থাপন করেছেন।অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের (তথা আপত্তিকারীদের) দাবি অনুসারে আল্লাহ্তা'লা তাঁর নবী খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর কবরকে দু জন কাফির, আত্মসাৎকারী ও বিশ্বাসঘাতকের গোরস্থানের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন! তিনি তাঁর নবী ও প্রিয় বন্ধুকে এ দুজন, অর্থাৎ আবু বকর ও উমরের পার্শ্বে থাকার যাতনা থেকে পরিত্রাণ দিলেন না বরং তাদের দুজনকে ইহকাল ও পরকালে তাঁর জন্য যন্ত্রণাদায়ক সাথি নিযুক্ত করলেন এবং (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁকে এ দুই নোংরা ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখলেন না! তারা যা বলে আমাদের প্রভু তাদের বর্ণিত কথা হতে পবিত্র। [তারা যা বলে ভুল বলে; বিষয়টি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-7 Thursday, 5-12 Jan, 2023 Issue No. 1-2

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আসলে এমন নয় যেমনটি বর্ণনা করা হয়।] বরং আল্লাহ্ তা'লা এ উভয় পবিত্রাত্মাকে পবিত্রদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মিলিত করেছেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৭২-৭৩)

এরপর তিনি (আ.) বিদ্বেষী শিয়াদের সম্পর্কে বলেন, বিদ্বেষী শিয়াদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, অস্বীকারকারী বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সাবালক পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল? তারা বাধ্য হয়ে বলবে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। এরপর যদি প্রশ্ন করা হয়, স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কে সর্ব প্রথম খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর সাথে হিজরত করেছিলেন এবং সেখানে গিয়েছিলেন যেখানে হুযূর (সা.) গিয়েছিলেন? তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। পুনরায় যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তর্কে র খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় তিনি আত্মসাৎকারী,(নাউযুবিল্লাহ্), যাদেরকে খলীফা বানানো হয়েছিল তাদের মাঝে প্রথম খলীফা কে ছিলেন? এক্ষেত্রেও এ উত্তর দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উত্তর থাকবে না যে, তিনি ছিলেন আবু বকর (রা.)। পুনরায় যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বিভিন্ন দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে কে কুরআন সংকলন করেছেন? তারা নির্দ্বিধায় বলবে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও নিষ্পাপদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পাশে কাকে দাফন করা হয়েছে তারা অবশ্যই এ কথা বলতে বাধ্য, তারা আবু বকর এবং উমর (রা.)। তাহলে কী আশ্চর্যের বিষয়! নাউযু বিল্লাহ্, সব ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল মুনাফিক ও কাফিরদের প্রদান করা হয়েছে আর ইসলামের সব কল্যাণ ও বরকত শত্রুদের হাতে প্রকাশিত হয়েছে! একজন মু'মিন কি ভাবতে পারে, ইসলামের সূচনা হয়েছে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে যে একজন কাফির ও অভিশপ্ত ছিল? এছাড়া রসূলদের গর্ব মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম যে হিজরত করেছে সে কাফির ও মুরতাদ ছিল! এভাবে এসব কথা মেনে নিলে তো সকল শ্রেষ্ঠত্ব কাফিরদের ঝুলিতেই চলে যায়! এমনকি পুণ্যবানদের সর্দার মুহাম্মদ (সা.)-এর কবরের নৈকট্যও।"

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৭৫-৭৬)

আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত কথা হলো, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর ফারুক (রা.) উভয়ই বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ দুজনঅধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে কখনোই ত্রুটি করেন নি। তাকওয়ার পথকে তারা জীবনের মূলমন্ত্র আর ন্যায়নীতিকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করেছেন। তারা পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতেন আর রহস্যের মূল পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন। জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করাকখনোই তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা নিজেদের জীবনকে সর্বদা খোদা তা'লার আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছেন। অসীম কল্যাণ এবং দোজাহানের নবী (সা.)-এর ধর্মের সমর্থনে শায়খাইন [অর্থাৎ আবু বকর ও উমর (রা.)]-এর মত অন্য কাউকে আমি দেখতে পাই নি। মানবকুল ও সকল ধর্মের সূর্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তঁারা উভয়েই চাঁদের তুলনায় অধিক গতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা তাঁর (সা.) ভালো বাসায় বিলীন ছিলেন আর সত্য ও সঠিক পথকে পাওয়ার বাসনায় সব কষ্টকে সুমধুর জ্ঞান করতেন। অনন্য ও অদ্বিতীয় নবী (সা.)-এর জন্য সব লাঞ্ছনাকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। কাফির ও অস্বীকারকারীদের সেনাবাহিনী এবং কাফেলার মোকাবিলায় তারা সিংহের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এভাবে ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে, বিরোধী সেনাদল পরাজিত হয়েছে, শিরক দূরীভূত ও নির্মূল হয়েছে এবং ধর্ম ও সত্য বিশ্বাসের সূর্য প্রদীপ্ত হয়েছে। গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয় ধর্মসেবা করে এবং মুসলমানদের স্কন্ধে অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বোঝা চাপিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে গিয়ে এ দুজনের জীবনের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহু আকবর! এই দুজন, অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কত মহান! এ দুজনই এমন এক কল্যাণমণ্ডিত সমাধিস্থলে দাফন হয়েছেন, মূসা ও ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা শত চেষ্টা করে হলেও সেখানে সমাধিস্থ হওয়ার বাসনা করতেন। কিন্তু এই পদমর্যাদা কেবল আকাঙ্ক্ষা করলেইপাওয়া যায় না আর শুধু বাসনা করলেই দেওয়া হয় না, বরং এটি হলো, সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে এক চিরস্থায়ী রহমত ও আশিস।"

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৭৭-৭৮, রূহানী খাযায়েন,৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৫-৩৪৬)

আরো কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ তা আগামীতে উপস্থাপন করা হবে।

১ম খুতবার শেষাংশ ....

চেয়ে এগিয়ে থাকেন, আজ আমি তার চেয়ে এগিয়ে যাব। একথা ভেবে আমি বাড়িতে যাই এবং আমার (সমস্ত) ধনসম্পদের অর্ধেকটা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করার জন্য নিয়ে আসি। সেই যুগ ইসলামের জন্য সীমাহীন কষ্টের যুগ ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে হাজির হন। একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) নিজের যাবতীয় সম্পদ, এমনকি লেপ এবং চৌকি পর্যন্ত নিয়ে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে সব জিনিস উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) -কে। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি ভীষণ লজ্জিত হই এবং আমি বুঝতে পারি, আজ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে অগ্রগামী হতে চেয়েছি, কিন্তু আজও আবু বকর এগিয়ে রইলেন।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কেউ বলতে পারে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন তাঁর যাবতীয় সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন তখন বাড়ির লোকদের জন্য তিনি কী রেখে এসেছিলেন? এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা উচিত, এর অর্থ হলো ঘরে সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন, ব্যবসায় যে সম্পদ লগ্নি করা ছিল তা নিয়ে আসেন নি আর বাড়িঘর বিক্রি করেও নিয়ে আসেন নি।"

(ফাযায়েলুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১১, পৃ: ৫৭৭) (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৭, পৃ: ১৩৪-১৩৫)

বরং তিনি (রা.) ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ ঘটনা থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর দুটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। একটি হলো তিনি (রা.) সর্বাধিক কুরবানী করেছেন, আর দ্বিতীয়টি হলো নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসা সত্ত্বেও সবার আগে পৌঁছে গেছেন। যারা অল্প দিয়েছিল তারা এ চিন্তায় ব্যস্ত ছিল যে, ঘরে কতটুকু রাখবে আর কতটুকু আনবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে কোথাও এর উল্লেখ নেই যে, তিনি অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। সব কিছু নিয়ে এসেছেন কিন্তু এমনটি হয় নি যে, আপত্তি করে বলেছেন, দেখ! আমি নিয়ে এসেছি, কিন্তু অন্যরা (এখনো) আনে না।

হযরত আবু বকর (রা.) কুরবানী করার পরও মনে করতেন, এখনো আমি খোদার কাছে ঋণী। আমি আল্লাহ্র প্রতি কোনো অনুগ্রহ করি নি, বরং আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হলো তিনি আমাকে তৌফিক দিয়েছেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৭, পৃ: ৫৮০)

অতএব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলছেন, যারা আর্থিক কুরবানী করেন তাদের নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত, আর সেই মুনাফিকদের মতো হওয়া উচিত নয় যারা নিজেরাও চাঁদা দেয় না, আর সামান্য কিছু দিলেও অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে, দেখ! অমুক কম দিয়েছে, অমুক এত দিয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সাহাবীদের সেই পবিত্র জামা'ত ছিল যাদের প্রশংসায় পবিত্র কুরআন পঞ্চমুখ। আপনারা কি এমন? অথচ খোদা বলেন, হযরত মসীহ্র সাথে সেসব লোক থাকবেন যারা সাহাবীদের অনুরূপ হবেন। সাহাবীরা তো এমন মানুষ ছিলেন যারা তাদের সম্পদ ও দেশকে সত্যের পথে উৎসর্গ করেছেন। সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর বিষয়টি অনেকবারই শুনে থাকবে, একবার আল্লাহ্ র পথে আর্থিক কুরবানী করার নির্দেশ হলে তিনি (রা.) ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) যখন জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কী রেখে এসেছেন? তখন উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, খোদা ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি? মক্কার নেতা হয়েও (যখন) কম্বল পরিহিত দরিদ্রদের পোশাক পরিধান করেছেন (তখন) বুঝে নিও, এসব লোক তো খোদার পথে শহীদ হয়ে গেছেন। তাদের জন্য লেখা আছে, তরবারির নীচে জান্নাত।"
(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, সাহাবীদের অবস্থা দেখ! পরীক্ষার সময় এলে যার কাছে যা কিছু ছিল আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সবার আগে কম্বল পরিধান করে চলে আসেন। কিন্তু এই কম্বলের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা কী দিয়েছেন? অর্থাৎ সবকিছু নিয়ে আসেন আর গায়ে শুধু একটি কম্বল জড়িয়ে নেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে কী প্রতিদান দিয়েছেন? সর্বপ্রথম খলীফা তিনিই হন। মোটকথা, এটিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ; [অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ করা।] তিনি (আ.) বলেন, কল্যাণ ও আত্মিক তৃপ্তি লাভের জন্য সেই সম্পদই কাজে লাগে যা খোদার পথে ব্যয় করা হয়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১০-২১১)

বাকি স্মৃতিচারণ আগামীতে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

**********

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir